শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব

হুমায়ুন কবির
লিখিত

"SARATCHANDRA CHATTERJEE"

গ্রন্থের অনুবাদ

অনুবাদক

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়



ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড্, কলিকাতা-৭

প্রকাশক :
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি. এ.
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং (প্রাইভেট) লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই পৌষ, ১৩৬৪

এক টাকা আট আনা

১.৫০ নয়া পয়সা

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উপক্রমণিকা

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ হয় তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে। তখন একবারও ভাবিনি যে, সেই সাক্ষাৎই হবে আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। এই ঘটনাটির উপলক্ষ্য ছিল কলিকাতার একটি সম্মেলন; এরই একটি অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশন শেষ হয়ে যাবার পর আমরা বাইরে বসে দু'জনে গল্পগাছি করেছিলুম।

শরৎচন্দ্র কিছুদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন, সেই কারণ পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজ করা তাঁর পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছিল। চিকিৎসকরা তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্রামের জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর অশান্ত প্রকৃতি তাতে সায় দিতে পারেনি।

কথাপ্রসঙ্গে সেদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কি ধরনের বই পড়তে আপনার সবচেয়ে ভাল লাগে?"

তিনি উত্তর দিলেন, "শরীরটা ভাল যাচ্ছে না ব'লে একটানা পড়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। একমাত্র যে বই আমার এখন পড়তে ভাল লাগে, তা হচ্ছে বিজ্ঞান।"

"বিজ্ঞান?" বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে আমি বলে উঠলুম, "আমি ভেবেছিলুম, আপনি বলবেন 'সাহিত্য'।"

তিনি উত্তরে বললেন, "সত্যই তুমি শুনে আশ্চর্য হবে যে, আজকাল আমি একখানা উপন্যাস কিছুতেই পড়ে উঠতে পারি না।"

বললুম, "এ তো বেশ মজার কথা! ভাবুন তো একবার, যিনি নিজে কত উপন্যাস লিখেছেন এবং যাঁর বই হাজার হাজার লোক আগ্রহ সহকারে পড়ে, তিনি কিনা নিজে একখানা উপন্যাস পড়ে উঠতে পারেন না!"

আমার কথা শুনে তিনি একটু হাসলেন। তারপর আমরা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলুম। তিনি আমাকে রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। অবশেষে আমি বললুম, "আমার সত্যই ভারী আনন্দ হচ্ছে এটা

জেনে যে, ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বাইরের কয়েকজন নামকরা সাহিত্যিকের মত আপনি শুধু কলালক্ষ্মীর আশ্রয়েই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চান না।"

তিনি উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন, "সে তো নয়ই, উপরন্তু এটাই আমি বিশ্বাস করি যে, জনসাধারণের ব্যাপার থেকে দূরে থাকা তো দূরের কথা, এমন কি সৃষ্টিধর্মী শিল্পীদের একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব আছে। প্রত্যেক দেশেই, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গঠনের সহায়তায় দেশের সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতীদের ভার বড় কম নয়। তাঁরা যদি এই সুস্পষ্ট দায়িত্বকে এড়িয়ে যান, তাহলে কী ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে? ভাবতবর্ষে বিদেশী শাসন একটি অতিরিক্ত উত্তেজনার কারণ, এবং তার ফলে স্বাধীনতার জন্যে কাজ করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য হয়ে পড়ে।"

তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে এটাই আমাব মনে হ'ল যে, ইনিই হচ্ছেন সেই লেখক যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব তাঁকে জনসাধারণের সঙ্গে এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেনি। হাজার হাজার লোক তাঁর অনুরাগী, অথচ আজও পর্যন্ত ইংরেজী পাঠক সাধারণের নিকট তিনি সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। হুমায়ুন কবিরের নিকট আমি এই বিষয়টি উল্লেখ করি এবং বর্তমান রচনাটি আমাদের সেই আলোচনারই ফল।

আমি যতদূর জানি অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরের এই সুলিখিত রচনাটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় লিখিত প্রথম পুস্তক। সমগ্র ভারতে শরৎচন্দ্রের বিপুল জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ করলে, এটি কম আশ্চর্যের বিষয় নয়। ভারতের প্রধান প্রধান সমস্ত ভাষাতেই তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে এবং কেবল যে সেগুলির অনেকগুলি করে সংস্করণ হয়েছে তা নয়, তাদের কতকগুলি সর্বাধিক বিক্রীতও হয়েছে। সেই কারণেই আমার মনে হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রকাশ খুবই সময়োচিত হয়েছে এবং বইখানি দীর্ঘকাল অনুভূত একটি অভাবও পূরণ করবে।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবির তাঁর কাজে যথার্থই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি যেমন শরৎ-সাহিত্যের প্রশংসা করেছেন, তেমনি প্রয়োজনীয় সমালোচনার দ্বারা সেই উচ্চ-প্রশংসার সমতাবিধানও করেছেন। মনে হয়, তিনি যেন আমাদের শরৎ-সাহিত্যের পরিক্রমায় পরিভ্রমণ করিয়ে এনে, তার মর্মস্থলে প্রবেশ ক'রে, রচনাশৈলী ও প্রকাশভঙ্গীর মাধুর্য বিকশিত ক'রে, শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির পটভূমিকাটি উদ্ঘাটিত করেছেন। কিন্তু তিনি শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেননি এবং সেই কারণে এখানে সে-সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করি।

শুধু লেখক হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেও শরৎচন্দ্রের জীবন সমান চমকপ্রদ। তাঁর সমগ্র জীবন এক অদ্ভুত অবস্থা-বিপর্যয়ের ইতিহাস।

মাত্র সাতাশ বৎসর বয়সে সম্পূর্ণ অপরিচিত, গৃহহীন শরৎচন্দ্র বর্মার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যখন তিনি রেঙ্গুনে পৌঁছান তখন তাঁর পকেটে মাত্র দুটি টাকা। সেখানে তাঁর এক অবস্থাপন্ন সহৃদয় মাতুল তাঁকে আশ্রয় দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই এই আত্মীয়টি অকস্মাৎ মারা যান, তার ফলে তাঁর সংসারে দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘটে। বাধ্য হয়ে শরৎচন্দ্রকে আবার নতুন করে ভাগ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হতে হয়।

অনেক ব্যর্থ চেষ্টার পর তিনি Examiner of Public Works and Accounts অফিসে অতি সামান্য বেতনে একটি কেরানীর পদ পান, এবং এই চাকরিটি যে তিনি তাঁর সুকণ্ঠের গুণেই পেয়েছিলেন, এ-কথা বললে ভুল বলা হবে না। তাঁর পরলোকগত মাতুল অঘোরবাবু তাঁকে স্থানীয় বাঙালী সমাজে পরিচিত করিয়ে দেন, এবং সুগায়ক শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গীতানুরাগের জন্য তাঁদের একান্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন। এই সূত্রে পরিচিত শ্রীএম, কে, মিত্র নামে এক ভদ্রলোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েই নিজের অধীনে তাঁকে এই কেরানীর পদটি দিয়েছিলেন।

এতকাল তাঁর জীবনে গভীর অধ্যয়নের সুযোগ ঘটেনি। এইবার জীবনে প্রথম শরৎচন্দ্র গভীর অধ্যয়নের সুযোগ পান। ছাত্রজীবনে অর্থের অভাবে F. A. পরীক্ষার 'ফি' জমা দিতে না পারায়, তাঁকে কলেজের পড়া

ছাড়তে বাধ্য হতে হয়েছিল। এই দুঃখ তাঁর অন্তরের অন্তস্তলে জমাট হয়েছিল। তাই শ্রীযুক্ত মিত্রের লাইব্রেরীর সন্ধান পেয়ে তিনি অধ্যয়নের মধ্যে ডুবে গেলেন। Mill, Kant, Hegel, Schopenhauer প্রভৃতি মনীষীদের দার্শনিক গ্রন্থগুলি তিনি ক্ষুধিতের আগ্রহে অধ্যয়ন করতে থাকেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলিও তাঁর পুনরায় পড়বার সুযোগ ঘটে।

একাগ্র সাধনার আনন্দে শরৎচন্দ্রের চিত্ত আপ্লুত হয়ে উঠল। একটা বিস্ময়কর অনুভূতিতে তাঁর সমস্ত চিত্ত ভরে গেল। এ যে কি, সে রহস্যের তিনি সন্ধান পেলেন না। কিন্তু চিত্ত তাঁর ক্ষণে ক্ষণে কৈশোরের ফেলে আসা দিনগুলিতে ফিরে যেতে লাগল।

তাঁর পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার সঙ্গে গভীর সাহিত্যানুরাগের সমাবেশ ঘটেছিল। জীবিকা-উপাজনের ব্যাপারটি তাঁর কাছে একান্ত বিরক্তিকর বলে মনে হ'ত। মতিলালের সাতটি সন্তানের মধ্যে শরৎচন্দ্র ছিলেন দ্বিতীয়। এক সময়ে এই বৃহৎ পরিবাবের সংসার-ভাব তাঁর কাছে দুর্বিষহ মনে হয। এই কারণে হুগলী জেলার দেবানন্দপুব গ্রাম ত্যাগ করে শরৎচন্দ্রের পিতা ভাগলপুরে তাঁর শ্বশুরালযে চলে যান। এই দেবানন্দপুর গ্রামেই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

শরৎচন্দ্রের পিতা বড় মজার মানুষ ছিলেন। সাহিত্যের এমন কোন বিভাগ ছিল না, যে সম্বন্ধে তিনি লেখনী চালনা করেননি। কাব্য, নাটক, ছোট গল্প, উপন্যাস কোন কিছুই তিনি বাদ দেননি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয, কোন রচনাটিই তিনি সম্পূর্ণ করেননি। মতিলালবাবু কখনও কখনও রাগ ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে কোন একটি চাকরি গ্রহণ করতেন, আবার কিছুদিন পরে চাকরি যখন তাঁর ভাল লাগত না, তখন ফিরে এসে আবার কোন নতুন সাহিত্যসৃষ্টিতে মনোনিবেশ করতেন। এই ভাবেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছিল।

কিশোর শরৎচন্দ্র সেই সকল অসমাপ্ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রচনাগুলি পরম আগ্রহ সহকারে পাঠ করতেন, আর সেই অসমাপ্ত রচনাগুলি কি হতে পারে ভাবতে

ভাবতে রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্রায় কাটিয়ে দিতেন। এই রচনাগুলি তাঁকে এমনই আকৃষ্ট করত যে, মাত্র সতরো বৎসর বয়সে তিনি নিজেই লেখনী ধারণ করেন। তখন রবীন্দ্র-সাহিত্যের দীপ্তিতে বাংলা-সাহিত্য সমুজ্জ্বল ; ভাবপ্রবণ তরুণ শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের এক একটি গল্প পড়েন আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ব্যর্থ রচনা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেন। শেষ পর্যন্ত তিনি স্থির করেন যে, যতোদিন না তিনি রবীন্দ্রনাথের মত লেখা লিখতে পারবেন, ততোদিন তিনি তাঁর লেখা প্রকাশ করবেন না।

এই সময়ে ভাগলপুরে একদল উৎসাহী তরুণ শরৎচন্দ্রের সভাপতিত্বে একটি সাহিত্য-সমিতি স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা অধ্যয়ন ও আলোচনার জন্য সভ্যরা প্রায়ই সেখানে মিলিত হতেন। কখনও কখনও তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ নিজেরাও কিছু লিখতেন এবং সেই লেখা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হ'ত। "ছায়া" নামক একটি হস্তলিখিত ছোট পত্রিকাও তাঁরা পরিচালনা কবতেন। এই পত্রিকাটিতে শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের কতকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়।

কিন্তু দারিদ্র্যের তিক্ততা সাহিত্যিক জীবনের রসসত্ত্বাকেও বিষাক্ত ক'রে তোলে। তাই শবৎচন্দ্রের সাহিত্য-সাধনা অকস্মাৎ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং একদিন তিনি কপর্দকহীন অবস্থায় গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করেন। তাঁর এই ভ্রাম্যমাণ জীবনে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসে মানব-জীবনের বহু রহস্যের তিনি সন্ধানলাভ করেছিলেন। এরপর আবার একদিন তিনি গৃহে ফিরে আসেন, কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত কোন লেখা তিনি লেখেননি।

প্রকৃতপক্ষে এক দৈবদুর্ঘটনার মতই শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক খ্যাতির তোরণ-দ্বারে এসে পৌঁচেছিলেন। এক ছুটিতে তিনি রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় এসে তাঁর পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যান। তাঁরা তখন সবেমাত্র "যমুনা" নামে একটি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন। শরৎচন্দ্রকে তাঁরা এই পত্রিকায় লেখবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানালেন। অনেককাল কিছু লেখননি বলে শরৎচন্দ্র প্রথমটা কিছুতেই লিখতে রাজী হননি, কিন্তু তাঁরা

ছাড়বার পাত্র নন, তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন। এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে বন্ধুরাও খুশি হলেন। কিন্তু রেঙ্গুনে ফিরে গিয়ে তাঁর বোধ হয় আর সে প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ ছিল না! শেষে বন্ধুরা চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম করে তাঁকে এমনই ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি আর লেখা না পাঠিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন না। তাঁর একটি গল্প "যমুনা"তে প্রথম প্রকাশিত হতেই সাহিত্যসমাজে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দিল, আর তার ফলে তিনি রাতারাতিই বিখ্যাত হয়ে উঠলেন। এই গল্পটি বেনামীতে প্রকাশিত হয়েছিল, তাই সে সময় এটিকে সকলে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে মনে করেন। শেষে ব্যাপারটি এমন হয় যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেই লেখাটির মালিকানাস্বত্ব প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করতে বাধ্য হন। পাঠক-সমাজ তো বিভ্রান্ত! তাঁরা ভাবতে লাগলেন, তবে কি সাহিত্যাকাশে কোন এক নতুন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব সুনিশ্চিত!

এই সময় থেকেই শরৎচন্দ্র লেখার জন্য বেশী সময় দিতে লাগলেন। তাঁব 'বড় দিদি' "ভারতী"তে ধাবাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসটি যে সংখ্যায় শেষ হ'ল, সেই সংখ্যায় তাঁর নাম মুদ্রিত কবা হয়। কিন্তু লেখা সম্বন্ধে এমনই তাঁর সঙ্কোচ ছিল যে, রেঙ্গুনে যখন তাঁর বন্ধুরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এটি তাঁরই লেখা কিনা, তখন তার উত্তরে তিনি দৃঢভাবে প্রতিবাদ করে বলেন যে, ও একটা আকস্মিক নামসাদৃশ্য মাত্র।

এরপর তিনি স্থায়িভাবে লেখায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর 'পবিণীতা', 'চন্দ্রনাথ', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি উপন্যাস ও কতকগুলি প্রবন্ধ "যমুনা"তে প্রকাশিত হয়। এগুলি ও আরও অন্যান্য রচনা প্রকাশে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। স্বনামধন্য নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁকে "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় লেখবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই শরৎচন্দ্র এই প্রসিদ্ধ পত্রিকাটির একজন প্রধান ও নিয়মিত লেখক হয়ে ওঠেন। 'শ্রীকান্ত', 'দত্তা', 'পল্লীসমাজ', 'গৃহদাহ' প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাস এই পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়।

১৯১৩ সালে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, এবং স্বাস্থ্যের কারণে তাঁকে বর্মা ত্যাগ করতে

বলা হয়। তখন বর্মায় তাঁর দশ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, মাসিক বেতনও হয়েছে এক শত টাকা। অতএব চিকিৎসকের নির্দেশে বর্মা ত্যাগ করা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কারণে অসম্ভব হয়ে পড়ে, কারণ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় একটি নিশ্চিত চাকরি ত্যাগ করতে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হন। এই ঘটনার কিছু পূর্বে তিনি তাঁর চারটি গল্প কলিকাতার এক প্রকাশকের নিকট অত্যন্ত সামান্য মূল্যে বিক্রয় করেন। এই প্রকাশক ব্যক্তিটি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভা লক্ষ্য করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে মাসিক এক শত টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন, এবং এই প্রতিশ্রুতিব উপর নির্ভর করেই শরৎচন্দ্র কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

অতি অল্পকালের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের রচনা বাংলা-সাহিত্যের একমাত্র আকর্ষণের বস্তু হয়ে ওঠে, ফলে তাঁর যশও আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি হতে থাকে। এমনি এক সময়ে দেশবন্ধু তাঁর "নারায়ণ" নামক মাসিক পত্রিকায় শরৎচন্দ্রকে লেখবার জন্য অনুরোধ জানান, এবং শরৎচন্দ্রও বিনা দ্বিধায় উক্ত পত্রিকায় লিখতে রাজী হন। তারপর শরৎচন্দ্র যখন তাঁর 'স্বামী' নামক গল্পটি "নারায়ণ" পত্রিকার জন্যে লিখে পাঠান, তখন সেই গল্পটি পড়ে দেশবন্ধু এতটা উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ একটি 'blank cheque' ও এই প্রসঙ্গে একখানি চিঠি লিখে পাঠান যে, এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখকের রচনার মূল্য নির্ধারণ করবার চেষ্টা তিনি করবেন না, শরৎচন্দ্র যেন তাঁর রচনার মূল্য নিজেই ধার্য করে নেন। দেশবন্ধু তখন দেশের একজন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী এবং শরৎচন্দ্র ইচ্ছা করলে উক্ত চেকে একটি মোটা টাকাব সংখ্যা বসিয়ে নিতে পারতেন, কিন্তু তিনি সামান্য একশত টাকা মাত্র নিয়ে সন্তুষ্ট হন।

তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তার পরিমাণ সেই সময়কার একটি ঘটনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁর রাজনৈতিক উপন্যাস 'পথের দাবী' দুই বৎসরব্যাপী "বঙ্গবাণী" নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও বইখানি যেদিন পুস্তকাকারে তিন টাকা মূল্যে প্রকাশিত হয়, সেই দিনই তার এক হাজার কপি বিক্রয় হয়ে যায়। প্রথম সংস্করণে পুস্তকটি ছাপা হয় মোট তিন হাজার, এবং এই তিন হাজার কপি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয় মাত্র

এক মাসের মধ্যে। এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণ ছাপা হয় পাঁচ হাজার, এবং তা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয় তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে। অকস্মাৎ রাজনৈতিক কারণে ইংরেজ সরকার গ্রন্থখানির প্রকাশ বন্ধ করে দেন।

শরৎচন্দ্র মূলতঃ গল্প ও উপন্যাস লেখক হলেও, তিনি তাঁর কয়েকখানি বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপও দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকখানি অতি সাফল্যের সঙ্গে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এ ছাড়া, চলচ্চিত্র জগতেও তাঁর রচনাগুলির চাহিদা সর্বাধিক।

কোন দুইজন প্রতিভাবান লেখকের রচনারীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী এক রকম নয়। শরৎচন্দ্রের রীতি তাঁর একান্তই নিজস্ব। অন্যান্য লেখকদের মত তিনি আখ্যান-ভাগ আগে থেকেই ভেবে নিতেন না। বিষয়বস্তুটি মোটামুটি স্থির করে নিয়ে, তারপর কয়েকটি প্রধান চরিত্র নির্বাচন করে, তাদের দ্বারা নিজের বক্তব্য পরিস্ফুট করে তুলতেন। যখন যেমন ভাব মনে আসত, সেই অনুসারে অনেক সময় তিনি গল্পের মাঝখান থেকেই লিখতে আরম্ভ করতেন, এমন কি কখনও কখনও উপসংহারটিই আগে লিখে, তারপর আরম্ভটি লিখতেন সব শেষে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, তাঁর 'চরিত্রহীন' এই পদ্ধতিতে লেখা।

তিনি কখনই তাড়াতাড়ি করে লিখতেন না। পাণ্ডুলিপি বার বার প'ড়ে তার বহু পরিবর্তন করতেন। লেখার জন্যে তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করতেন এবং রচনাশৈলীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। লেখাটা তাঁর কাছে কেবলমাত্র একরাশ কথা সাজানো ছিল না—সেটি ছিল একপ্রকার গভীর মানসিক প্রক্রিয়া।

তাঁর অমর চরিত্রসৃষ্টি তাঁর সৃজনীপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান। কিন্তু তাঁর রচনার প্রধান কৃতিত্ব এই যে, অতি তুচ্ছ ও সাধারণ ঘটনাবলীর সরস ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, এবং তাঁর সংলাপচাতুর্য ছিল এক অনন্যসাধারণ বস্তু। এতদ্‌ব্যতীত শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অবাধে ও অকুণ্ঠভাবে ব্যবহার করতেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী।

বাংলা দেশের সামাজিক অবস্থা তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থের পটভূমিকা রচনা

করেছে, এবং এই বাংলাদেশ জমিদার ও জমিদারতন্ত্রের দেশ। সেই কারণে তাঁর উপন্যাসে যে-সমাজ চিত্রিত, তা এই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ভূম্যধিকারী সমাজ। এই সমাজের তিনি এমন অকপট ও নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করেছেন, যার তুলনা একমাত্র টলষ্টয়ের রচনাতেই পাওয়া যায়। সমাজ-জীবনের সঙ্গে জমিদারের প্রত্যক্ষ কোন যোগসূত্র না থাকায় যত প্রকার কুফল, হীন ষড়যন্ত্র সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলে.ছ, তার বীভৎস বাস্তবরূপ তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়ে আমাদের সম্মুখে এক শতজীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু সমাজের রূপ উদ্ঘাটিত করেছে।

এরই পাশাপাশি বাংলার পল্লীজীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাও খুব আশাপ্রদ নয়। তাঁর 'পল্লীসমাজ-এ' দেখা যায় গ্রামগুলি অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এবং জরাজীর্ণ প্রথার কবলে কবলিত। গ্রামবাসীদের উন্নত করবার বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা কোথাও কোথাও হয়েছে বটে, কিন্তু তা বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। শহর থেকে যাঁরা পল্লীসংস্কারের ব্রত নিয়ে পল্লীতে এসে কাজ করবার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা অল্পকালের মধ্যে বিরক্ত হয়ে এ কাজ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এ থেকে কি এটিই অনুমান হয় যে, শরৎচন্দ্র পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে নিরাশ হযে পড়েছিলেন? এ কখনই সত্য হতে পারে না। আসল কথা, তিনি পল্লীজীবনকে আদর্শান্বিত না করে, ঠিক যেমনটি দেখেছিলেন তেমনটিই চিত্রিত করেছেন। পল্লীগ্রামে বাস করে পল্লীজীবনের সঙ্গে তিনি অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, এবং সেই কারণেই পল্লীগ্রামের উন্নতির পথের বাধাগুলিকে তিনি লঘু করে দেখত চাননি। তাঁর মতে বাধাগুলি একপ্রকার উদ্দীপনাই দান করে। তিনি নিজেও গ্রামে বাস করতেই বেশী পছন্দ করতেন।

প্রতিভাবানদের খেয়ালগুলি তাঁদের জীবনের একটি উপভোগ্য অংশ। চার্লস ডিকেন্স সম্বন্ধে শোনা যায় যে, শেষ জীবনে তিনি যতক্ষণ না কোন একটি জানালার ধারে, একটি নির্দিষ্ট টেবিলের সামনে, একটি নির্দিষ্ট চেয়ারে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে ব'সে, কোন একটি বিশেষ দৃশ্য না দেখতে পেতেন, ততক্ষণ তিনি কিছু লিখতে পারতেন না। আবার টেবিলের উপর একটি বিশেষ ছবি

না থাকলে এমিল জোলার পক্ষে লেখা নাকি মোটেই সম্ভব হ'ত না। এই কারণে শরৎচন্দ্রের খেয়ালগুলির আলোচনাতেও আনন্দ আছে।

প্রতিষ্ঠালাভ করবার পর শরৎচন্দ্র দামী কাগজ ছাড়া লিখতেন না। তাঁর মতে মনোরম লিখন-সরঞ্জাম সাহিত্যকলাব অর্ঘ্যস্বরূপ। বোধ হয় আব কোন লেখকই নেই যিনি তাঁর গ্রন্থগুলি ও গল্পগুলি নিয়মিত এমন সুন্দর ও মূল্যবান কাগজে লিখেছেন। তিনি সকল সময খুব সরু নিবওয়ালা মোটা এবং লম্বা ঝরনা-কলম ব্যবহার করতেন, এবং অক্ষরগুলিও যথাসম্ভব সুন্দর কবে লিখতেন।

'হুঁকা' ছাড়া তিনি এক মুহূর্ত থাকতে পারতেন না, এমন কি যখন তিনি লিখতেন, তখনও এই বস্তুটির ব্যবহার বন্ধ থাকত না। চা পান করতেও তিনি খুব ভালবাসতেন, এবং প্রায়ই এক সঙ্গে কয়েক পেযালা চা খেতেন। এইভাবে সারা দিনে তিনি বহুবার চা পান কবতেন।

তিনি কিছু কিছু হোমিওপ্যাথি ও বায়োকেমিক চিকিৎসা সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং নিজের ব্যয়ে গ্রামের লোকদের দরকার মত ওষুধ দিতেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন, কিন্তু গৃহপালিত জীবজন্তু তাঁর খুব প্রিয় ছিল। নানাপ্রকার পাখি, কাঠবিড়ালী, কুকুর প্রভৃতি তিনি পুষেছিলেন।

ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে শবৎচন্দ্রের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর সাহিত্যেও তাঁর একটি বিশেষ স্থান আছে। কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে? উত্তরকালে তাঁর রচনার মূল্য কি নির্ধারিত হবে, সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ নয়। কিন্তু এ চিন্তা মনে জাগে, কাবণ তাঁর মননধারা বিপ্লবাত্মক ছিল না। সামাজিক বিষয়গুলিব আলোচনায় তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব সাবধানী ছিলেন না। সমাজের অন্যায়গুলি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ অপূর্ব, কিন্তু প্রাচীন সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তিনি কোন আধুনিক সমাধান দেননি। বরং, বর্তমানের সমস্যাগুলির মীমাংসার জন্য তিনি অতীতের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, এবং তাঁর রচনায় সামাজিক ব্যবস্থাগুলির আমূল সংস্কারের কোন ইঙ্গিত নেই।

তবুও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং আমাদের জন্যে রেখে গিয়েছেন এক

বিরাট সম্পদ। বর্তমানকালে তাঁর সমকক্ষ কোন ঔপন্যাসিক আর ভারতে জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তার মূলে আছে তাঁর অপরূপ শিল্পচাতুর্য, মনোরম রচনাশৈলী, সুনিপুণ বর্ণনা কৌশল ও অসাধারণ চরিত্র-চিত্রণ ক্ষমতা। এ ছাড়াও তাঁর রচনায় এমন কতকগুলি গুণ আছে যা সাহিত্যরীতির পরিবর্তন-প্রবণতায় সহজে আক্রান্ত হবার নয়।

শেষ জীবনে তিনি প্রচুর সম্মান ও সুখের অধিকারী হয়েছিলেন, যদিও সে সময় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি 'সাহিত্যাচার্য' (D. Litt.) উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। পাঠকগোষ্ঠীর নিকট হতে তিনি যে প্রীতিলাভ করেছেন, তা ক্বচিৎ কারুর ভাগ্যে ঘটে থাকে। ১৯৩৮ সালের ১৬ই জানুয়ারী, বাষট্টি বৎসর বয়সে, তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে সাহিত্যের একটি যুগের অবসান ঘটেছে।

ইউসুফ্ মেহেরআলি

মুখবন্ধ

শরৎচন্দ্রের রচনার বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংক্ষেপে প্রকাশ করাই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। বাংলা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রেব স্থান অনন্যসাধারণ বলা যায়, কিন্তু বাংলার বাইরে তাঁর যে পরিচিতি হওয়া প্রয়োজন তা বোধ হয় আজও তাঁর হয়নি। সম্প্রতি, তাঁর কতকগুলি গ্রন্থের হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। কতকগুলি ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তা এতই সামান্য যে তা থেকে বাঙালী পাঠকের মনের উপব শরৎচন্দ্রের প্রভাবের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায যে, কোন অবাঙালী পাঠকের পক্ষে সে প্রভাব কী গভীর ও ব্যাপক তা ধারণা কবাও কঠিন। এমন কি, যাঁরা সে সম্বন্ধে খানিকটা খবর রাখেন, তাঁদেব পক্ষেও তা সম্যক উপলব্ধি করা সহজ নয়।

প্রথম দৃষ্টিতে কথাটি আশ্চর্য বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এই রহস্যেব সমাধান সহজ। যে সামাজিক পটভূমিকায় শবৎচন্দ্রের প্রতিভার বিকাশ, বর্তমান প্রবন্ধে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা হয়েছে। লেখক ও তাঁব পবিবেশেব মধ্যে যে সম্পর্ক তা নির্ধারণ না ক'রে কোন লেখকেরই লেখার সম্যক বিচাব কবা সম্ভবপর নয়। আর শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে তো তা একেবারেই অসম্ভব। শরৎচন্দ্রের লেখার প্রতি বাঙালীর যে উচ্ছ্বসিত সহানুভূতি প্রকাশ পায, তা দেখে অবাঙালী পাঠকের বিস্ময় লাগে। তাঁর রচনার শক্তি ও সৌন্দর্য কেউ অস্বীকার কবে না। তাঁর গল্প-রচনার শিল্পচাতুর্য ও সৌকর্যের প্রশংসায অবাঙালী পাঠকও আমাদেব সঙ্গে একমত। তবুও তাঁদেব মনে হয শরৎচন্দ্রের প্রতি বাঙালীর যে আকর্ষণ তা বোধ হয় খানিকটা অতিবিক্ত। ফলে অবাঙালীর মনে বাঙালী চরিত্রের দৃঢ়তা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। অপরপক্ষে বাঙালী পাঠক মনে করেন যে, শরৎচন্দ্রের মেহনীয়তা, স্বপ্রকাশ, এবং তাঁব যথাযোগ্য প্রশংসা করতে যিনি নারাজ, তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধেরই অভাব। এই দুটি বিরোধী অভিমত নিয়ে বিচার করলে শরৎ-প্রতিভার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য

অনুধাবন করা যায় এবং সেই সঙ্গে কেন যে বাঙালী পাঠকের মনের উপর তাঁর এই প্রভাব তারও হদিস পাওয়া যায়। বাংলা দেশে তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ বা গুরুত্বপূর্ণ লেখক হয়ত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর মত জনপ্রিয় দ্বিতীয় কোন লেখকের আর পরিচয় মেলে না।

বাঙালী পাঠকের মনের উপর শরৎচন্দ্রের এই যে গভীর প্রভাব, তার গোপন রহস্য হ'ল, শরৎচন্দ্রের প্রকৃতি ছিল ষোলআনা বাঙালী। এ থেকে এটা বুঝায় না যে, রক্ত বা জাতি সম্পর্কে তাঁর কোন বদ্ধমূল ধারণা ছিল। বরং এ থেকে এটাই নিঃসংশয়ে প্রকাশ পায় যে, একই স্থানের এবং একই কালের লোকেদের মধ্যে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সম্বন্ধের সমন্বয়ে একটা প্রত্যক্ষ সমতার উদ্ভব হয়। তার ফলে অন্য দেশের বা যুগের লোকের তুলনায় তাদের একটা পৃথক সত্তা গড়ে ওঠে। এই ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিষয়গুলি শুধু যে রক্ত ও জাতি সম্পর্কেই ক্রিয়াশীল তা নয়। রাজনৈতিক ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিও এদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পরস্পরের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করে। এই পারস্পরিক প্রভাবক্রিয়াশীলতার ফলে জাতীয় চরিত্র গড়ে উঠে। বিভিন্ন জাতির চরিত্রে উপাদানে হয়ত কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু সংমিশ্রণ ও গুরুত্ব-আরোপণের পার্থক্যের ফলে মানুষের মধ্যে জাতীয় পার্থক্য দেখা দেয়। শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে বাঙালী, তাই বাংলা দেশের লোকের তিনি এত প্রিয় হতে পেরেছিলেন।

বিশেষ করে তাঁর মধ্যকালের লেখাগুলি সম্পর্কে কথাটি বিশেষভাবে খাটে। তাঁর গোড়ার লেখাগুলিতে কেবলমাত্র যে শিক্ষানবীশের ছাপই বর্তমান তা নয়, উপরন্তু সেগুলি অতিমাত্রায় ভাবাবেগে উচ্ছল। যথার্থ শিল্পীর স্থৈর্য ও ভারসাম্য থেকে বহুক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত। ভাবাবেগের প্রাবল্যের দরুন অচিরেই তাঁর জনপ্রিয়তা ব্যাপকতা লাভ করে বটে, কিন্তু তা'তে তাঁর রচনায় বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেনি। তাঁর পরবর্তী রচনায় তিনি বেশীর ভাগ সময় নূতন ভাবধারার বন্যায় ভেসে গিয়েছেন। সর্বক্ষেত্রে সে সব ভাবধারার সঙ্গে তাঁর সুগভীর পরিচয় বা আত্মীয়তা ঘটেনি। তাঁর সকল রচনার মধ্যেই প্রবল উদ্দেশ্যমূলক ইঙ্গিত বর্তমান, কিন্তু পরবর্তী

উপন্যাসগুলিতে এই সুর অধিকতর তীব্র রূপ ধারণ করেছে। আর্টের দাবীর চেয়ে উদ্দেশ্যের দাবীকে তিনি এসব লেখায় বেশী স্থান দিয়েছেন। তার কারণ হয়ত এই যে, মানুষের মন তখন নতুন সমাজ ব্যবস্থার দিকে অগ্রসব হতে আরম্ভ করেছিল, পুরাতন জগতের নৈরাশ্যবাদ ধীরে ধীরে কমে আসছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের সংঘর্ষ থেকেই ভারতীয় চিন্তারাজ্যে একটা দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয়। মহাত্মা গান্ধীর প্রবল আন্দোলন হিন্দু ও মুসলমানকে একটা সংগ্রামশীল ভ্রাতৃত্বেব বন্ধনে আবদ্ধ করে। ভারতের স্থির জীবনযাত্রায় একটা আলোড়ন দেখা দেয়। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করবার উপায নেই যে, এই পরিবর্তনেরও প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। পুরাতন ব্যবস্থার পুনরভ্যুত্থানের নিদর্শনও বিরল ছিল না। তবে এ কথাও বলা যায় যে, সমগ্র ভারতে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনের কতকগুলি ফল স্থায়ী হয়েছে। জোয়ারের ঢেউযের জল কিছুক্ষণ পরে সরে যায়, কিন্তু জমিব সীমাচিহ্নের পরিবর্তন বজায থাকে। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনেও ভাটা পড়ল, কিন্তু পূর্বের অবস্থা আর ফিরে এল না। শবৎচন্দ্র এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং এই আলোড়নের নিদর্শন তাঁর রচনাব মধ্যে স্থায়ী ভাবে রয়ে গেছে। তিনি এই নূতন ভাবধারার আবেদন নিজেব মধ্যে অনুভব করেছিলেন, কিন্তু তার গভীরতার মধ্যে প্রবেশ করেননি। তার তথ্য ও তত্ত্ব নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে যে পরিশ্রমের প্রযোজন ছিল, তা করবার মত উৎসাহ তাঁর ছিল না। তাঁর মধ্যযুগের রচনাগুলিতে সত্যেব ছাপ অধিকতর প্রকট। চরিত্রগুলি সব জীবন্ত, কারণ তাদের মধ্যে তিনি বাস করেছেন, তাদের দুঃখকষ্টের অংশ গ্রহণ করেছেন। তারা তাঁর পূর্ব-কল্পিত কোন ধারণার মানুষ নয়, তারা তাঁর কল্পনা ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ থেকে সৃষ্টি।

শরৎচন্দ্রের পরিণত জীবনের রচনাগুলিতে বাঙালী সমাজ-জীবনেব দুটি বিপরীত দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ স্বাভাবিক নরনারীর জীবন একদিকে, অপরদিকে সামাজিক রীতি-নীতির শেষ সীমায় বিচরণকারী ভবঘুরে ও ছন্নছাড়ার দল। মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ

জীবনের চিত্র কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু যে সহজাত সদয়তার দরুন জীবনযাত্রার দ্বন্দ্বের তীব্রতার উপশম হয়, তারও অভাব ঘটেনি। একদিকে সামাজিক অবহেলা ও অত্যাচার, অন্যদিকে ব্যক্তির নিষ্ঠুরতা ও কোমলতা, এই দুই বিরুদ্ধভাবের এক অদ্ভুত সমন্বয়সাধন করা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে কিছুই বাদ পড়েনি, কাবণ তাঁর পরিণত রচনাগুলিতে তিনি সত্যদ্রষ্টাব মত সমাজের বিভিন্ন জীবনকে অতুলনীয় নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় কোন বস্তুর আবির্ভাবে তাঁর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি। প্রতিটি চরিত্র প্রাণশক্তিব প্রাচুর্যে উদ্ভাসিত। তাদের সংস্থান ও পটভূমি স্থায়ী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের সামাজিক গুরুত্ব মুখ্য, গৌণ নয়।

বাঙালী জীবনের সঙ্গে এই নিবিড় পরিচয় ছিল বলেই শরৎচন্দ্র বাঙালীর এত প্রিয। এই একই কারণে অবাঙালী পাঠকদেব নিকটে শরৎচন্দ্রের এই বিপুল জনপ্রিয়তা থানিকটা বিস্ময়কব মনে হয়। মানুষের চরিত্রে এমন কতকগুলি উপাদান আছে যা দেশকালনির্বিশেষে সকল নরনারীর মধ্যেই বিদ্যমান। শরৎচন্দ্রের লেখায তার প্রকাশ গভীব বলে তাঁর রচনার একটা সার্বজনীন আবেদন আছে। আবার তাদের মধ্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ আছে যা প্রত্যেক দেশেব বৈশিষ্ট্য, তাই অন্য দেশের বা জাতির লোকের পক্ষে বাঙালী পাঠকের নিকট শরৎচন্দ্রেব চমৎকারিত্বের কারণ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

শরৎচন্দ্র প্রধানতঃ গল্প-লেখক। তাঁর বিষয়বস্তু প্রায়ই খুব সরল। একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। কখনও কখনও চরিত্র-চিত্রণে তাঁর শৈথিল্য দেখা যায়, চবিত্রের দুটি-একটি বিশেষত্ব আমাদের মনের মধ্যে অঙ্কিত করে দিয়েই তিনি সন্তুষ্ট। এমন কি একই চরিত্র বা অনুরূপ চরিত্র বিভিন্ন নামে প্রকাশ করতে তিনি ইতস্ততঃ করেননি। কখনও কখনও একটি বিশেষ ধরনের চরিত্র অঙ্কন না করে একটি প্রতিভূ-চরিত্রের প্রকাশেই বেশী ঝোঁক দিয়েছেন। একজন প্রথমস্তরের শিল্পীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, এর সবগুলিই

শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে আরোপিত হয়েছে। একটি অভিযোগের কথা কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে শোনা যায়নি এবং তা করা সম্ভবও নয়। সেটি হচ্ছে, তিনি অতুলনীয় গল্পকার এবং বর্ণনাকারী। তার বর্ণনার মধ্যে যে স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীলতা তাতে তাঁর ঘটনা-বিন্যাসের সকল ত্রুটি এবং চরিত্র-চিত্রণের সকল বিচ্যুতি ভুলে যেতে হয়। তাঁর গল্পগুলি প্রচণ্ড স্রোতের মত বেগে বয়ে যায় এবং পাঠক নিরুদ্ধ উৎকণ্ঠায় তার সঙ্গে ভেসে চলে।

সমাজ-সম্পর্কে তাঁর সুগভীর সহানুভূতির ফলে তাঁর এই বর্ণনাশক্তি আরও শক্তিশালী হযেছে। অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তাঁর বাল্যজীবন কাটে। তাই সামাজিক রীতি-নীতিব উপর তাঁর মোটেই আস্থা জন্মায়নি। অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত স্থানে তিনি বিরাট মহত্ত্বের সন্ধান পেয়েছেন। অপবপক্ষে সামাজিক ভদ্রতার আচবণের মধ্যে বহু ক্ষেত্রে অন্তবের নীচতাই দেখেছেন। মানুষের বহিপ্র্রকাশের অন্তবালে তাব যেটা যথার্থ সত্তা, শরৎচন্দ্র তাবই সন্ধান নিয়েছিলেন।

তাঁব সহানুভূতির ক্ষেত্র ছিল বিশাল। তাঁর বাল্যজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁকে এই শিক্ষাই দিয়েছিল যে, মানুষের গোপন চিত্তলোকে প্রবেশ কবতে হলে সমালোচক ও আত্মম্ভরির আচরণ পরিহার কবতে হবে। সৌহার্দ্যলাভেব প্রকৃষ্টতম উপায় হচ্ছে সমবেদনা ও সহৃদয়তা।

শরৎচন্দ্রেব সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে জীবন সম্বন্ধে তাঁব এই গভীব ও ব্যাপক সহানুভূতিব পরিচয় পাওযা যায। তাঁর নিকট মানুষ মাত্রেই তাঁব ভাই। তিনি তাদের বিচার করবার চেষ্টা কবেননি, বা তাদের সংস্কার করারও চেষ্টা করেননি। তাদেব ভালবেসে এবং তাদের ভালবাসা লাভ করেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি শুধু তাদের ভালবাসাই লাভ করেননি, সেই সঙ্গে লাভ করেছিলেন বোধশক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি। ফলে, তাঁর সাহিত্য-রচনা বাঙলাভাষাব অমূল্য সম্পদ হযে রয়েছে। তাঁব অসামান্য বর্ণনাশক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সকলশ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর অসীম প্রীতি ও সহানুভূতি।

বাংলার জাতীয় লেখক হচ্ছেন শরৎচন্দ্র এবং চিরদিন তিনি তাই-ই থাকবেন। এই কারণেই আরও প্রয়োজন, যে অপরে, বিশেষ করে অন্য

প্রদেশের এবং অন্য ভাষাভাষী ভারতীয়েরা, তাঁর রচনার সঙ্গে আরো নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়ে তাঁকে বুঝুন। বাঙালীর কর্তব্য হচ্ছে অপরের নিকট তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া। শরৎ-সাহিত্যের প্রসাদে অবাঙালীরা বাঙলার জীবন ও চিন্তাধারার সঙ্গে গভীরতর পরিচয় লাভ করবে।

এই পুস্তকখানি সেই প্রয়াসেরই নিদর্শন।

হুমায়ুন কবির

প্রথম পরিচ্ছেদ

উনিশ শতকের শেষার্ধে শরৎচন্দ্রের জন্মের অল্পবিস্তর দশ বৎসর পরে ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অভ্যুত্থান একটি কম উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয়। ১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রামের পর ভারতের রাজনৈতিক-জীবনে যে অবনতি ঘটেছিল, ক্রমশঃ তা জনসাধারণের চেতনা থেকে লুপ্ত হতে আরম্ভ করে। প্রতীচ্যের ভাব ও সংস্কৃতির অন্তঃধারায় প্রাচীন রক্ষণশীলতার স্থৈর্য ব্যাহত হয় এবং এক বিত্তশালী আরামপ্রিয় সম্প্রদায়ের ক্রমিক অভ্যুত্থানে নূতন সামাজিক ও বাজনৈতিক কাঠামো নির্মাণেব দুঃসাহসিকতা দেখা দেয়। একদিকে পল্লীগ্রামের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও দৈন্য, অন্যদিকে যাতায়াতের যানবাহনের উন্নতিসাধনের ফলে জনসাধারণের একটি বিপুল সংখ্যা পল্লী ত্যাগ ক'রে শহরে ছুটে আসাব প্রেরণা পায়, এবং সেই সঙ্গে তাদের চিন্তারাজ্যেও দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। সাহসী তরুণেরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সামাজিক সংস্কারের স্বপ্ন দেখতে আবম্ভ করে। একটা নব-জাগরণের স্পন্দন আকাশে-বাতাসে ব'য়ে যেতে থাকে এবং ভারতবাসীব এই নূতন উদ্দীপনা ভারতীয় জাতীয় মহাসভার মধ্যে রূপায়িত হতে চায়।

এই সময় শরৎচন্দ্রের বয়ঃক্রম দশ বৎসরের অধিক ছিল না, অতএব এই পরিবর্তনে তাঁর অংশগ্রহণ করবার কথা নয়। কিন্তু তিনি ছিলেন বাঙলার হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছেলে, এবং এই বিরাট সামাজিক সম্প্রদায়টিই দেশের নব-আহ্বানে অগ্রণী হয়ে এগিয়ে আসে। উপরন্তু তাঁর বাল্যজীবনের প্রথমাবস্থা প্রকৃতপক্ষে বাংলার বাহিরে তথা ভাগলপুবে অতিবাহিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই সময়ে এই জায়গাটি শাসনব্যবস্থার দিক থেকে বাঙলারই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৃহত্তর বাঙলার প্রচারকেরা এই উক্তিটিকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হলেও, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, এটি সীমান্ত অঞ্চলভুক্ত। প্রবাসীরা এবং সীমান্তবাসীরা স্বভাবতই জাতি ও ভাষা সম্বন্ধে অধিকতর সংবেদনশীল হন। এই সচেতনার দরুনই সামাজিক জীবনে তাঁদের কর্তব্যবোধ

অধিকতর জাগ্রত থাকে। মধ্যবিত্ত বাঙালীর মধ্যে দেশের রাজনৈতিক উন্নতির জন্য উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল। জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে তাঁরা নিজেদের অগ্রণী মনে করেছিলেন। অতএব সীমান্ত অঞ্চলে এই মনোভাবের অধিকতর তীব্রতা স্বাভাবিক। রাজনৈতিক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশই সীমান্তাঞ্চল থেকে এসেছিলেন। ভাগলপুরের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর পারিবারিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। প্রবাসী সমাজের লোকেরা স্বভাবতই খুব আত্মকেন্দ্রিক এবং আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে চেতনাশীল। সীমান্তবাসীরা প্রায়শই প্রথাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে আগ্রহান্বিত। গভীর অরণ্যে একটি নির্জন কেবিনের মধ্যে সান্ধ্য-ভোজ উপলক্ষ্যে প্রবাসী ইংরেজের পোশাকের প্রতি নিষ্ঠা, এই মনোভাবেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু, শরৎচন্দ্র সাধারণ মানুষ ছিলেন না। তাঁর সংবেদনশীল এবং সজাগ চিত্তে বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার রূপ একটি সহনশীল দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করেছিল, যদিও তা সংশয়বাদ থেকে মুক্ত ছিল না। এর ফলে তাঁর সহানুভূতি ও কল্পনার পরিধি যথেষ্ট বিস্তারলাভ করে। শুধু তাই নয়, সমাজ-ব্যবস্থার সামান্যতম পরিবর্তনও তাঁর চিত্তে রেখাপাত করত এবং তার ফলে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর তীব্র অনুভূতি হয়েছিল।

অতএব এটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, প্রথম যৌবন থেকেই তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠবেন। এই বিদ্রোহী ভাবটি কেবলমাত্র তাঁর সাহিত্যে নয়, তাঁর জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে। যে পারিবারিক এবং সামাজিক আবহাওয়ায় তাঁর জন্ম, তা'তে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষার মধ্যে দিয়ে তিনি একটি সম্মানজনক বৃত্তি গ্রহণ ক'রে জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখভোগ করবেন, এইটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু তা না হয়ে তাঁর মধ্যে একটা তীব্র সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হতে থাকে। বিশেষ ক'রে বাল্যাবস্থাতেই যাঁর চিত্ত এতটা সংবেদনশীল তাঁর পক্ষে এটা হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

এই কারণে একটা সুগভীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক চেতনাবোধ শরৎচন্দ্রকে বাঙলার অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের নিকট হতে পৃথক করে রেখেছে। তাঁদের মধ্যে যে এই দাহ নেই তা নয়, কিন্তু তা অতি ক্ষীণ বা চঞ্চল। এদিক

থেকে বলতে গেলে বলতে হয় যে, প্রত্যেক শিল্পীরই সামাজিক নীতিবোধ থাকা একান্ত প্রয়োজন, নচেৎ তিনি প্রকৃত শিল্পী হতে পারেন না। অধিকাংশ লেখকেরই মধ্যে এই বোধ স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়াশীল। তাঁদের মননশীলতার এটি একটি অঙ্গস্বরূপ, এবং এই কারণে তা তাঁদের সচেতন শিল্পীমনের বস্তু নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে এই সামাজিক নীতিবোধ তাঁর শিল্পকলার মূল উপাদান ও উদ্দেশ্য। শরৎচন্দ্রের বাল্যকালটা বাঙলার সীমান্ত অঞ্চলে অতিবাহিত হওয়ার দরুনই সামাজিক ভালমন্দ সম্বন্ধে তাঁর সক্রিয় চেতনাবোধ জাগ্রত হয়েছিল। সীমান্ত অঞ্চলে বহু রকমারী সামাজিক জীবনযাত্রার সংঘর্ষ বাধে। এই কারণে কোন একটি বিশেষ ধারাকে সহজে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব হয় না। সাধারণ লোক এই রকম পরিবেশের মধ্যে পড়ে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং অতিরঞ্জন করে। এই প্রথানিষ্ঠ জীবনযাত্রাকে মেনে নেওয়া শরৎচন্দ্রের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। যদিও ছাত্র হিসাবে তাঁর ভবিষ্যৎ ছিল আশাপ্রদ, কিন্তু তিনি হঠাৎ পুস্তক পাঠ থেকে মন সরিয়ে নিয়ে গেলেন জীবনেব পাঠ আরম্ভ করতে। ফলে, এই অল্প বয়সেই তাঁর যে বিচিত্র অদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল, তা'তে জীবনের বহুদিক তাঁর নিকট উদ্ঘাটিত হ'ল যা ঐ বয়সে তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। তাঁর পরবর্তী সৃষ্টিতে এদের বহু নিদর্শন স্মরণীয় হয়ে আছে। সামাজিক সম্মানের দিক থেকে যা তিনি হারিযেছিলেন, তাঁর সৃষ্টির মাল-মসলার ঐশ্বর্যে তা পূরণ হযে গিয়েছিল।

তাঁর সৃষ্টির প্রথম দিকটাকে পরীক্ষামূলক গল্পের কাল বলা যায় এবং এই সময়ের খ্যাতি ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাঁর খ্যাতির বিরাট সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল যখন নিখিল-বঙ্গ গল্প প্রতিযোগিতায় তাঁর একটি গল্পের জন্য তিনি প্রথম পুরস্কার লাভ করেন—এই প্রতিযোগিতায় তখনকার সমূহ খ্যাতিবান সাহিত্যিকই যোগদান করেছিলেন। তাঁর যেমন স্বভাব, এই গল্পটি তিনি ছদ্মনামে পাঠিয়েছিলেন এবং এই ব্যাপারটি তাঁর কতিপয় বন্ধু ব্যতীত আর কেউই জানতেন না। যেন এই সম্মানে ভয় পেয়েই তিনি হঠাৎ বাঙলা দেশ থেকে অন্তর্ধান হন। এই সময় প্রায় দশ বৎসর অজ্ঞাতে তিনি বর্মায় কাটান। পরিশেষে, সম্ভবতঃ, সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালীর ভাগ্যই তাঁকে আশ্রয় করেছিল,

তাই একটা সওদাগরী অফিসে বাঁধা মাহিনাতে তিনি চাকুরি নেন এবং প্রচলিত ভদ্রলোকের জীবনযাপন করেন।

কিন্তু বিদ্রোহ ছিল তাঁর রক্তের মধ্যে, তাই বাহিরে সামাজিক ব্যবস্থাকে মেনে চললেও, ভিতরে তা তাঁর অন্তর স্পর্শ করেনি। বর্মার হালকা সামাজিক জীবন তাঁর দুরন্ত প্রকৃতির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গিয়েছিল, এবং এর ফলে ভারতীয় মনের গভীরতায় প্রবেশ করবারও তাঁর সুযোগ ঘটেছিল। প্রত্যেক প্রদেশ ও প্রত্যেক সামাজিক জীবনের মানুষই সেখানে বাস করত। ভারতবর্ষে যারা স্থান, কাল ও ধর্মবিশ্বাসে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল, তারা হঠাৎ একত্র হয়ে একটি সঙ্ঘবদ্ধ জীবনযাপনে বাধ্য হয়েছিল। সামাজিক শ্রেণী হিসাবে বা বৃটীশ কলোনিস্টের মত এই শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে তারা সেখানে যায়নি। তারা গিয়েছিল ব্যক্তিগতভাবে—সমাজবন্ধন থেকে ছিন্ন হয়ে। তাদের মধ্যে অনেকেরই প্রকৃত কোন সমাজবন্ধন ছিল না—তারা ছিল সম্পূর্ণ ভাসমান মানুষ। এই ভাবে পরিচিত সামাজিক পরিবেশের বাধা-নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে তারা সম্পূর্ণভাবে তাদের সহজাত বৃত্তি ও স্বভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ফলে, এমন একটি নূতন বাধা-বিহীন শিথিল সমাজ-জীবন গ'ড়ে উঠেছিল যেখানে ব্যক্তির নিরঙ্কুশ জীবনযাত্রার আর সীমা ছিল না।

'শ্রীকান্ত' গ্রন্থে, যেটি শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলা যায়—ভারতীয়দের জাহাজের ডেকে বসে রেঙ্গুন যাত্রার একটি বর্ণনা আছে। কি শহর, কি গ্রাম, সব জায়গা থেকেই নরনারী এসে একত্র হয়েছে সুদূর সীমান্তের অধিবাসীদের সঙ্গে। উড়িষ্যার কারিগর এবং সিন্ধুর দোকানদার, অন্ধ্রের শ্রমিক এবং রাজপুতানার সওদাগর কেউই সেখানে বাদ যায়নি। ফলতঃ জাহাজের খোল সমগ্র ভারতের চুম্বকে পরিণত হয়েছিল। যখন এই জনতা কলিকাতা শহরে জাহাজে ওঠে, তখন প্রত্যেক দল এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেদের বসবার মত স্থানটুকু চিহ্নিত ক'রে নেয়ঃ একটি নির্দিষ্ট সীমানা-বেষ্টিত স্থান যার সঙ্গে বাইরের বিপুল জনতার যোগসূত্র ছিন্ন। এই সঙ্কীর্ণ এবং স্বতন্ত্র গণ্ডীগুলির মধ্যে থেকে তারা পরস্পরের মুখ-চাওয়াচায়ি করে এবং এমন কি তাদের মধ্যে মৌখিক বন্ধুত্বও হয়। ভারতের কেন্দ্রীভূত সত্তা—ধর্মগত, সম্প্রদায়গত,

ভাষাগত, প্রদেশগত এবং প্রথাগত সকল শ্রেণীর ভারতবাসীই সমুদ্রযাত্রা করেছে। এই সমুদ্রযাত্রা শেষ হবার পূর্বেই সব কিছুর পরিবর্তন ঘটে। যে কৃত্রিম বেষ্টনীর দ্বারা যাত্রীরা পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল তা নিশ্চিহ্নভাবে মুছে যায়। একটা প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা জাহাজের উপর ফেটে প'ড়ে খোলের মধ্যস্থিত বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও ব্যক্তিগুলিকে একটা অচ্ছেদ্য আবর্তনের মধ্যে একীভূত করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে যে-মানুষটি অন্ধ্র থেকে এসেছিল সে তখন কোন এক সীমান্তবাসীর বুকের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। একজন বাঙালী রাজপুতানার এক সওদাগরের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গেছে যে তাকে উন্মোচন করা সহজসাধ্য নয়। ঝড় থেমে যেতে, আবার তারা নিজেদের গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করে। তখন তারা তাদের পূর্বের গণ্ডী দেওয়া স্থানে ফিরে এসে যে-যার বাসস্থান স্থির করে নেয়। তারপর তারা আবার তাদের পূর্বের আলাপ-পরিচয় জমিয়ে তোলে। প্রাচীন ভারতীয় জীবনের যেন একটা ছায়ামূর্তির নবজাগরণ ঘটে, কিন্তু তারা সকলেই অনুভব করে যে, এ ছায়ামূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের চিরাচরিত সংস্কারগুলি ঝড়ের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছে, অন্ততঃ যতদিন তারা বর্মায় কাটাবে, ততোদিন তাদের উপর সংস্কারগুলির প্রভাব থাকবে না।

বর্মায় যে ভারতীয় জীবনের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ছিল, জাহাজের খোলের দৃশ্যটি তারই প্রতিরূপ। চিত্তের সুপ্রশস্ত উদারতা এবং সুতীব্র সমাজবোধবশতঃ তিনি এ থেকে শুধু জ্ঞানলাভই করেননি, বিভিন্ন সমাজ-জীবনকে ভালবাসতেও শিখেছিলেন। অতি-বাল্যকালে এক সীমান্ত শহরে থাকার সুযোগ হওয়ায় সংস্কারের প্রতি তাঁর তেমন আস্থা ছিল না, এবং এর ফলে তাঁর কল্পনার পরিধিও বিস্তৃত হয়েছিল। তারপর, যৌবনে বর্মায় থাকার ফলে তাঁর মনের উদারতা কায়েমী হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি স্থির উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষের যোগ্যতার বিচারে প্রচলিত নিয়ম-কানুনের প্রশ্ন তোলা সম্পূর্ণ অবাস্তব। এই সেদিন পর্যন্ত জাতিভেদ ও ছুতমার্গ হিন্দু সমাজের মজ্জাগত ছিল। কেউ কেউ হয়ত বলতে পারেন আজও তা তেমনিই আছে। অসবর্ণ-আহার ও অসবর্ণ-বিবাহের নিষেধাজ্ঞার উপরেই জাতিভেদ

ও ছুতমার্গ প্রতিষ্ঠিত। বর্মার ভারতীয় সমাজ, অন্ততঃ তার একটা মুখ্য অংশ, এই দুটি নিষেধকে অস্বীকার করেই গড়ে উঠেছিল। 'পথের দাবী' গ্রন্থে শরৎচন্দ্র একটি বর্মী পরিবারের চিত্র এঁকেছেন যার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাদ্রাজের এক মুসলমানের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ; দ্বিতীয় কন্যা চট্টগ্রামের এক ভারতীয় পর্তুগীজের সঙ্গে, তৃতীয় কন্যা একজন এ্যাংলো-ভারতীয়ের সঙ্গে এবং চতুর্থ কন্যা একজন ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা চীনার সঙ্গে। আর, শুধু এই একটি মাত্র ঘটনাই নয়। আখ্যায়িকার যিনি নায়িকা সেই মেরী ভারতী হচ্ছেন একজন বাঙালী ব্রাহ্মণের কন্যা, যিনি স্ত্রী-কন্যাসহ খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা বাঙ্গালোরের এক এ্যাংলো-ভারতীয়কে বিবাহ ক'রে রেঙ্গুনে বসবাস করেন।

এই ভাবে সকল সামাজিক-বিশ্বাস ও প্রথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তির জীবন চরম স্বেচ্ছাচারিতার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। বেশীর ভাগ স্বদেশত্যাগীদের জীবন এই কর্দমে কর্দমাক্ত হয়েছিল। নিজের দেশের সমাজে যে সামাজিক জীবনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছিল তা পরিত্যাগ ক'রে তার পরিবর্তে তারা কোন নূতন সর্ববাদিসম্মত সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে তুলতে পারেননি। তার ফলে তারা একটা এমন সামাজিক আবহাওয়ায় পড়েছিল, যেখানে স্বার্থপরতা ও রিরংসা প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। কাম-প্রবৃত্তি ও অবাধ যৌন-অনাচার প্রকাশে কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি, এটাই রীতি হয়ে উঠেছিল। ভোগ ও নীতির দ্বিবিধ জীবন-যাত্রার প্রবাহ একত্রে প্রবাহিত হয়েছিল। স্বদেশত্যাগী দেশে ফেরার দিনটির জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত—যখন আবার সে তার পরিত্যক্ত সামাজিক নিয়মগুলিকে যথারীতি মেনে চলবে। ইত্যবসরে তার যে জীবনযাত্রা তাতে ভোগলালসার পরিতৃপ্তি ছাড়া নীতির কোন বালাই ছিল না। 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থে শরৎচন্দ্র এই নৈতিক শঠতার এক কঠোর চিত্র এঁকেছেন। এক স্বদেশত্যাগী বাঙালী বর্মায় বহু বৎসর অতিবাহিত করবার পর বাংলা দেশে ফিরছে। এই মানুষটি বর্মার এক রমণীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল—মনের দিক থেকে তার তরফে বিবাহটি ছিল সাময়িক, কিন্তু রমণীটি একে অন্তরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য মিলন ব'লে গ্রহণ করেছিল। এখন বর্মা থেকে চিরকালের মত সে দেশে ফিরছে, কিন্তু স্ত্রী

তার তা জানে না। সে তার স্ত্রীকে এই বোঝায় যে, হঠাৎ তাকে একটা জরুরী কাজে দেশে ফিরতে হচ্ছে, কাজ শেষ হয়ে গেলেই সে আবার ফিরে আসবে। ছেলেপুলে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটি স্বামীকে বিদায় দিতে এসেছে। কপট অশ্রুধারা তার দুই গণ্ডদেশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে এবং এই সাময়িক বিচ্ছেদের জন্যে সে করুণ কণ্ঠে দুঃখের ভান করছে। বস্তুতঃ সে তার বন্ধুদের সামনে তাকে ব্যঙ্গ করছে। দেশে ফেরার মতলব ক'রে এই নির্লজ্জ লম্পট ঐ হতভাগিনীর দুঃখে বিদ্রূপ করছে।

সামাজিক বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একজন মানুষ কিবকম নির্লজ্জ স্বার্থপর হয়ে উঠতে পারে, শরৎচন্দ্র এই দৃষ্টান্তটির দ্বারা সেটিই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি এটিও বুঝিয়েছেন যে, মানুষের মন কত বিচিত্র এবং সুন্দররূপে প্রকাশ পায়, যদি সামাজিক রীতি-নীতির একঘেয়ে সমতা থেকে তা মুক্ত হয়। এই ভাবে তাঁর অভিজ্ঞতা যত গভীব হযেছে, সেই সঙ্গে মানুষেব আদিম স্বভাবধর্মের সঙ্গেও তাঁর তেমনি পরিচয ঘটেছে। সমাজে সাধারণ মানুষের জীবনে সংস্কারগুলিই বিশ্বাসের স্থান গ্রহণ করে। অভ্যাসগুলি এমন-ভাবে তার মনের ভাবগুলির উপর একটা কঠিন আববণ সৃষ্টি কবে, যাব ফলে আমরা তার অন্তরের মণিকোঠায প্রবেশ কবতে পাবি না। তার ধর্ম ও অধর্ম দুই-ই প্রথাগত চিরাচরিত দৃষ্টান্তের প্রকাশ, যা তার ব্যক্তি-প্রতিভার উপব ন্যস্ত রয়েছে। এই কারণে তার আচবণে বাহ্যিক নীতির কোন অভাব ঘটে না, কিন্তু তার মধ্যে সেই সৃজনশীল আত্মপ্রকাশ নেই যা এর মূল সত্তা। তার নীতি ও দুর্নীতি দুই-ই সত্য, তা কেবলমাত্র অভ্যাসের বস্তু নয়। এই দিক থেকে শরৎচন্দ্রের বর্মাবাস তাঁর পক্ষে চরম লাভের বস্তু হয়েছিল। তাঁর পক্ষে এ ভয়েব সম্ভাবনা ছিল না যে, অসামাজিক কদাচারে তাঁর চিত্ত কলুষিত হবে। অতি বাল্যকাল থেকেই একটা গভীর ও জাগ্রত সমাজবোধ তাঁর জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই যে মহামূল্য অভিজ্ঞতা তিনি বর্মায় সঞ্চয় করেছিলেন তা'তে তাঁর সমাজবোধই অধিকতর তীক্ষ্ণ হয়েছে।

প্রায় দশ বৎসরকাল শরৎচন্দ্র বর্মায় অতিবাহিত করেন। তাঁর বন্ধুদের নিকটে তিনি কতকগুলি গল্প রেখে যান. এবং তাঁর অনুপস্থিতির সময়ও তাঁর

বিনা অনুমতিতে 'বড়দিদি' ছদ্মনামে তিন কিস্তীতে প্রকাশিত হয়। এইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যক্ষেত্রে বেশ একটু সাড়া পড়ে যায় এবং অনেকেই এটিকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে স্থির করেন। এ সম্বন্ধে বেশ একটি মজার গল্প আছে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। এই উপন্যাসের প্রথম স্তবক প্রকাশিত হতে তাঁর কর্মাধ্যক্ষ একদিন তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে রুষ্টভাবে এই বলে অভিযোগ জানান যে, তাঁর পক্ষে এটা খুবই অন্যায় হয়েছে যে তিনি একখানি নূতন উপন্যাস লিখেছেন অথচ তাঁকে জানান নি, আর তাও কিনা আবার একখানি বিপক্ষীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে! রবীন্দ্রনাথ তো তা শুনে অবাক, শেষে অনেক কষ্টে তিনি তাঁকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিলেন যে ঐ লেখাটি সত্যিই তাঁর রচনা নয়। কর্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের যুক্তি ছিল এই যে, বাঙলা দেশে এমন লেখক আর কেউ নেই,—নতুন তো দূরের কথা, যিনি এ গল্প লিখতে পারেন। এই ঘটনাটি যথাকালে শরৎচন্দ্রের কর্ণগোচর হয়েছিল, এবং রসিকতা হিসাবে তিনি এটিকে যতটা উপভোগ করেছিলেন, নিজের সম্পর্কে প্রশংসা হিসাবে তা করেননি।

'বড়দিদি' প্রকাশের পাঁচ বৎসরের মধ্যে শরৎচন্দ্রেব আর কোন খবর শোনা যায়নি। জনসাধারণ এই লেখাটি পড়ে আনন্দ উপভোগ করেছিল, কিন্তু তা নিয়ে খুব বেশী হইচই করেনি। বিচারশীল সমালোচকরা লেখাটির মধ্যে একটা সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিলেন, এবং একজন উদীয়মান নূতন লেখক হিসাবে রচনাকারকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁর রচনা আর প্রকাশ না হওয়াতে প্রথমটা সকলেই আক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তাঁর সম্বন্ধে জনসাধারণের উৎসুক্য ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। শেষে ধীরে ধীরে তাঁদের চেতনা থেকে তিনি বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। শরৎচন্দ্র জনসাধারণের চেতনাকে একেবারে বাত্যাবিদ্ধ ক'রে তুলেছিলেন গল্পের পর গল্প লিখে, এবং সে সকল গল্পের যে কোন একটি, যে কোন লেখকের সুনামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম ছিল। 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বিরাজ বৌ' এবং 'চরিত্রহীন'—উপর্যুপরি এই শ্রেণীর উচ্চাঙ্গের রচনাবলী প্রকাশ হওয়ায় বাঙলাদেশ প্রথমে

বিস্ময়ান্বিত হয়ে গিয়েছিল, শেষে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। যেন আকাশ থেকে কোন উল্কাপাত হয়ে বাঙলার সাহিত্যাকাশকে আলোকিত করে তুলেছিল। শিশুচিত্তের ভাব-রহস্য, মোহমুক্ত চিত্তের গোপন কামনারাশি বা বাঙলার গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতগুলি তাঁর রচনায় এমন সহানুভূতিপূর্ণ ও জীবন্তভাবে রূপায়িত হয়েছে যা পূর্বে কখনও হয়নি।

যেভাবে এই সাহিত্যিক বিস্ময় সঙ্ঘটিত হয়েছিল তা শরৎচন্দ্রের প্রকৃতিরই অনুরূপ। 'বড়দিদি' প্রকাশের পাঁচ বৎসর পরে তিনি অকস্মাৎ বাঙলাদেশে প্রত্যাগমন করেন। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে এই গল্পটি পড়িয়ে শোনাতে অনুরোধ করেন এবং তা শুনে তিনি যেন অবাক হয়ে যান, এই ভেবে যে তিনি নিজে সেটি লিখেছেন। প্রকৃতই তিনি খুব বিচলিত হয়েছিলেন এবং এই ব'লে আক্ষেপ করেছিলেন যে, লেখা ত্যাগ ক'রে দেওয়াটা তাঁর উচিত হয়নি। গল্পটি সত্যিই ভাল ছিল, কিন্তু তাঁর মনে সন্দেহ জাগে যে এরকম গল্প আর কি তিনি লিখতে পারবেন। যাই হোক, তিনি আবার লেখবার চেষ্টা ক'রে দেখবেন, কিন্তু তাঁব পোষ্য অনেকগুলি এবং তাঁর একমাত্র সংস্থান বর্মায় চাকরির মাহিনাটুকু। তাঁর বন্ধুরা তাঁকে দেশে ফিরে আসবার জন্যে খুব অনুরোধ জানালেন। তাছাড়া একশত টাকার যে সামান্য বেতন ওখানে পান, এখানে তা পাবার নিশ্চয়তাও তাঁকে দিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র মনস্থির করতে পারলেন না। তাঁর মনে হ'ল 'বড়দিদি' হঠাৎ এক রকম ফাঁকি দিয়ে হয়ে গেছে ব'লে তারপর কি হবে তার নিশ্চয়তা নেই, তাই তিনি বললেন যে, তিনি আবার লেখবার চেষ্টা করে দেখবেন। কিন্তু এর তিন মাসের মধ্যেই তিনি 'চরিত্রহীন'-এর এক-চতুর্থাংশ প্রায় লিখে ফেলেছিলেন। এই বইখানির জন্যেই তিনি পাঠক সমাজের কাছে বিশেষ পরিচিত।

একদিন শরৎচন্দ্র সত্যিই বাঙলায় ফিরে এলেন। তারপর এক বিস্ময়কর যুগের সূচনা হ'ল। ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা অতি দ্রুতগতিতে তাঁর রচনা প্রকাশ হতে লাগল। এতে শুধু যে তাঁর সুনাম প্রতিষ্ঠিত হ'ল তা নয়, দেশবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধাও তিনি লাভ করলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর শিল্পী-জীবনের বিনয় থেকে কখনও চ্যুত হননি। পরবর্তীকালে যখন বাঙলা-সাহিত্যে তাঁর

স্থান এমনি সুপ্রতিষ্ঠিত যে, দেশবাসীর মনে তাঁর আন্তর্জাতিক সম্মানলাভের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেই সময়েও নিজের রচনা সম্বন্ধে তাঁর স্বভাবসুলভ কুণ্ঠা যায়নি। তিনি একেবারে বিস্ময়ে আভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, যখন তিনি শুনেছিলেন যে, তাঁর 'শ্রীকান্ত'-র এক ফরাসী সংস্করণ খুব সমাদৃত হয়েছে। তিনি বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, এ গ্রন্থে এমন কি আছে যা বিদেশীদের ভাল লেগেছে।

শরৎচন্দ্রের সত্যকার সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত হয় এই সময়ে। তিনি একমনে তাঁর শিল্পী-জীবনের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। বোধ হয় তাঁর মত নিষ্ঠা নিয়ে আর কেউ ইতঃপূর্বে সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হয়নি। এমন কি, সাহিত্যকে তাঁর বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করার মধ্যেও একটা বিপ্লবাত্মক বস্তুর ইঙ্গিত ছিল। এই সময় পর্যন্ত বাঙলার লেখকরা সকলেই প্রায় সখের বশে লিখতেন। কারুর কাছে সাহিত্য ছিল একটা আমোদের বস্তু, আবার কারুর কাছে ছিল একটা কাজ। আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যের প্রথম ও প্রধান স্রষ্টা মধুসূদন দত্ত জীবিকার জন্য আইনের ব্যবসা করতেন এবং চিত্তবিনোদনের জন্য কবিতা লিখতেন। বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী চাকুরির দ্বারা জীবিকার্জন করতেন, আর অবসর সময়ে উপন্যাস লিখতেন। রবীন্দ্রনাথ, যিনি প্রতিভা ও ঐশ্বর্য দুই-ই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন, তাঁর জীবনে জীবিকার জন্যে উপার্জনের প্রয়োজন হয়নি, তাই সাহিত্যকে তিনি একটা কাজ হিসাবে মনে করে তাঁর সৃষ্টিশক্তিকে নিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চাকুরির সামান্য বেতনই ছিল তাঁর জীবিকার্জনের একমাত্র উপায় এবং তাই সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে তিনি শুধু যশের কামনাই করেননি, সাহিত্যকে তিনি তাঁর জীবিকার উপায়স্বরূপও গ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর পূর্বে পেশাদার সাংবাদিক অনেক ছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রই বোধহয় বাঙলার প্রথম পেশাদার লেখক। একে তিনি বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, সখ হিসাবে নয়। সাংবাদিকরা হুকুম মত সাময়িক বিষয়ের উপর লিখতেন। একথা প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য মত ছিল যে, অর্থকরী কার্য কখনও আর্ট হতে পারে না। আর্ট হচ্ছে এমন বস্তু যা শুদ্ধ ও পবিত্র। বাজারের সম্পর্কে এর

মূল সত্তার ধ্বংসসাধন হয়, এবং তা সাময়িক রচনায় পরিণত হয়। জীবনের স্থূল দাবীগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আর্টের বিষয়বস্তুর পরিধিও খুব সীমাবদ্ধ ছিল। ক্ষুধা, খাদ্য এবং জীবিকার উপায়গুলি আর্টের পক্ষে অত্যন্ত স্থূল বিবেচিত হ'ত। শিল্পীর সৃজনীশক্তির বিষয় বা প্রেরণা হিসাবে তাদের কোন স্থান ছিল না। এই রুচিবোধের স্বাভাবিক পরিণতির ফলে যৌন, প্রেম, কাম সবই একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। একটা আচারনিষ্ঠ সঙ্কীর্ণ নীতিবোধ সেই সময়কার সকল লেখকেরই দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এই কারণে সাহিত্যকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করাটা দুই দিক থেকেই বিপ্লবাত্মক ছিল। এর ফলে আর্ট ও জীবনের মধ্যে সমস্ত ব্যবধান ঘুচে গিয়ে সাহিত্য যেমন বাজারের স্তরে নেমে এসেছিল, তেমনি আর্টের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায় সেই সব বস্তু তার সীমানার মধ্যে এসে পড়েছিল যা পূর্বে অস্পৃশ্য ছিল। সাধারণ মানুষের উপর নির্ভরতাবশতঃ সাহিত্যিককে তার সম্পর্কে বেশী করে চিন্তার প্রযোজন হযে পড়েছিল। শবৎচন্দ্রের এবং তাঁর অনুগামীদের রচনায় সাধারণ মানুষের প্রেম ও বিতৃষ্ণা, আনন্দ ও দুঃখ সম্পর্কে যে চেতনা তা এই কারণেই আকস্মিক নয়। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এও একটা অংশ—ক্রমবর্ধমান ধনতান্ত্রিক ও মধ্যবিত্ত সমাজের অভ্যুত্থানের সঙ্গে এর যোগসূত্র স্থাপন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না—যার ফলে সাহিত্য তাব পূর্বেকাব নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর সংশ্রব ছেড়ে বৃহত্তর জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

শরৎচন্দ্রের পরবর্তী জীবন খুব সংক্ষেপেই বর্ণনা করা যায়। যে সাফল্য তিনি অর্জন করেছিলেন, একদিকে তা যেমন তাঁকে যশ ও খ্যাতি এনে দিয়েছিল, আর একদিকে তেমনি দিয়েছিল তাঁকে স্থায়িত্ব ও ঐশ্বর্য। কিন্তু তিনি যে প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তা'তে এই স্থায়িত্বে তিনি সন্তুষ্ট থাকবার নন। তাই অনবরত নিজের ব্যক্তিত্বের নূতন নূতন প্রকাশে তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যে শুধু তাঁর সাহিত্যকে নিয়েই পরীক্ষা করেছিলেন তা নয়, নিজের জীবনকেও তিনি এই পরীক্ষার মধ্যে টেনে এনেছিলেন। আর এই রকম পরীক্ষার মধ্যে দিয়েই তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন যে, জীবনের সকল মলিনতাই সামাজিক অব্যবস্থাপনের কুফল। সমাজ সংক্রান্ত

অনুচিত ব্যবস্থাপনের অন্তরালেই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনাচার নিহিত। অতএব এটা অবশ্যম্ভাবী যে শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে বিপ্লবাত্মক মনটি ছিল, সে এই অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এক নূতন অবস্থার গোড়াপত্তনে আগুয়ান হবে। যখন বাজনীতিব আবর্তে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁর শিল্পী-মনের স্বপ্নগুলি তিনি বিস্মৃত হননি। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ তিনি দেখিয়েছেন ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও আইন-অমান্য আন্দোলনের সময়।

১৯৩২ সালে যখন রাজনৈতিক আন্দোলনেব অবনতি ঘটল, তখন শরৎচন্দ্র আবার নূতন ক'রে তাঁব বিশ্বাসের পূর্ব-মীমাংসাগুলি পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাঁব লেখায বিদ্রোহেব সুর আরও প্রখর হয়ে উঠল। কারুর কারুব মতে সে প্রখবতা ককশতারই নামান্তর। ধর্ম ও রাজনীতি, সমাজ ও নৈতিকতা সম্বন্ধে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনেব অনুভূতিতে তিনি অভিভূত হযে পড়েছিলেন। সম্ভবতঃ সে ধাবণাগুলি তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ কবতে পাবেননি। হযত সকল বৃহত্তব সংস্কাবের পূর্বে ধ্বংসাত্মক আকাঙ্ক্ষাই বলবৎ হযে ওঠে। সে যাই হোক, তাঁব পববর্তী রচনাগুলি দ্বিধা ও সংশয়ে কণ্টকিত। একদিকে প্রচণ্ড আগ্রহে নূতনকে আহ্বান, অপরদিকে পুবানোর বিলুপ্তিসাধনেব চিন্তায ক্ষোভ। যে সমাজে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তার প্রতি তাঁব আকর্ষণ একটা নূতন গভীবতা লাভ করলেও, তাঁর শিল্পীজনোচিত দৃষ্টি এর ফলে মাঝে মাঝে ব্যাহত হযেছে। একটা নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সর্ব-ব্যাপক চাহিদাগুলির সঙ্গে একটা ধ্বংসোন্মুখ সমাজের কতকগুলি বিধি-ব্যবস্থার প্রতি প্রচ্ছন্ন-মোহের একটা সমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার পূর্বেই তাঁর জীবনের অবসান ঘটেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজ সম্পর্কে সুতীব্র সচেতনতাই শরৎচন্দ্রকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। সমাজের বাধা-নিষেধের কবল থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ যে কিরকম মনুষ্যত্বহীন হতে পারে তা তিনি দেখেছিলেন। সামাজিক বন্ধনহীনতা শুধু মানুষের স্বার্থপরতাকেই প্রধূমিত করে তা নয়, মানুষের মহত্ত্বের বৃত্তিগুলিকেও বর্ধিত ও গভীরতর করে। এই কারণে সমাজ হচ্ছে অনেকটা গাড়ির 'ব্রেক্'-এর মত যা মানুষের ভাল ও মন্দ দুই-ই নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু তার নিয়ন্ত্রণ-শক্তি অত্যন্ত বাহ্যিক, তা না হ'লে এই শক্তির শৈথিল্যে বা নিষ্ক্রিয়তায় অমন প্রচণ্ড উন্মত্ততা ঘটতে পারত না,—যা তিনি বর্মার জীবনে দেখেছিলেন। অতএব মানুষের আচরণকে যন্ত্রের মত নিয়ন্ত্রণ করাই সব নয়। যদি সমাজ তার অনুজ্ঞাকে যথার্গ মূল্য দিতে চায়, তাহলে তাকে মানবিক প্রকৃতি গ্রহণ করতে হবে, শুধু নির্দেশ দিলেই হবে না। তাছাড়া তা না করবারও কোন কারণ নেই। যদি সমষ্টির মঙ্গলের জন্যেই সমাজের জন্ম হয়ে থাকে, তাহলে তার নির্দেশ ব্যক্তির নিজের স্বার্থের জন্যেই তার উপর কার্যকরী হবে। এ অবস্থায় সকল রকম বাধ্যতাই অসঙ্গত। তবে কেন বাধ্যতার প্রশ্ন না থাকলে মানুষ এত সহজে সমস্ত সামাজিক বন্ধনকে অবাঞ্ছিত উপদ্রবের মত ছিন্ন করতে চায়?

এই প্রশ্নের চিন্তায় শরৎচন্দ্র এই সত্যে উপনীত হয়েছিলেন যে, অতীতে যা হয়েছে হোক, বর্তমানে ভারতীয় সমাজ হচ্ছে সংরক্ষিত স্বার্থস্তূপের প্রতীক। তাঁর দৃষ্টি হিন্দু-সমাজের উপরই পতিত হয়েছিল, তবে অন্য সমাজের অবস্থাও এই, সামান্য কিছু হেরফের থাকতে পারে। বর্তমান অবস্থাকে চালু রাখবার জন্যে যথেচ্ছ বিধি-নিষেধ আবোপ করা হয়েছে। সংরক্ষিত স্বার্থের রক্ষণই শৃঙ্খলা ও শান্তির অজুহাতে প্রচলিত। এমন কি, নীতি ও ধর্ম বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে একের দ্বারা অপরের শোষণের যন্ত্রবিশেষ। এই কারণে সামাজিক ভালমন্দের প্রত্যয় মূলেতেই কলুষিত হওয়ায় মানুষের মূল্য বিচার করবার পক্ষে তা শুধু অপরিমিত নয়, অসারও।

তবে শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি থেকে এটা বাদ যায়নি যে সামাজিক বিধি-নিষেধগুলি যতই প্রাণহীন হোক্, মানুষের জীবনেব ছোটখাটো দোষ-ত্রুটিগুলিকে সংগ্রহ করবাব শক্তি তাদের আছে। সমাজেব শাসনে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বেব সম্যক স্ফুরণ বাধা পায়, এই কাবণে মানুষের সহজাত সৎপ্রবৃত্তি প্রাযশই বিকৃতিলাভ করে। এক পক্ষের বিধি-নিষেধেব চাপে অপবপক্ষের অনাচাব অধিকতর তীব্ররূপে প্রকাশ পায়, এবং তা'ব ফলে সামাজিক মূল্যগুলি কলুষিত হয়। এই দুই চরম বিরোধিতাব মধ্যে এমন এক শ্রেণীব মানুষের কার্যকলাপ সঙ্ঘটিত হয়, যার ভাল বা মন্দ কোন দিকই উল্লেখযোগ্য নয। তাদেব মধ্যে সেই জীবনীশক্তি থাকে না, যা অভিজ্ঞতাকে বৈশিষ্ট্যে ও মর্যাদায বিভূষিত করতে পাবে, তবুও সাধারণ সামাজিক জীবনযাত্রাব মধ্যে তাবা বিপরীত পথগামী বলে গণ্য হয়। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাব প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ ক'বে তাবা স্বেচ্ছাচাবী হযে ওঠে। কিন্তু এই স্বেচ্ছাচাবিতার মধ্যেও জীবনীশক্তি না থাকায তাবা অতি তুচ্ছ ও লক্ষ্যহীন মানুষে পবিণত হয—পঙ্গুর ব্যর্থবোষ বা জবাগ্রস্ত লম্পটেব লাম্পট্যের মত।

শবৎচন্দ্রেব মধ্যে বিপ্লবাত্মক প্রেরণা থাকা সত্ত্বেও তাব মধ্যে এমন একটি বক্ষণশীলতাব ভাব আছে, যাব জন্যে সমযে সমযে মানুষ অবাক হয়ে যায়। এই বিষযটি বিশেষভাবে লক্ষ্য কবা যায় তাঁব নাবীচবিত্র-চিত্রণে। তাঁব বহু নায়িকা সামাজিক বীতি-নীতির বিবোধিতা কবেছে। তাদেব কাকব কারুর মধ্যে এমনি বুদ্ধির চমক ঝলসে উঠে নিবে গেছে যা সত্যিই অদ্ভুত। সামাজিক জীবনে এবং চিন্তাবাজ্যে সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েও অন্তঃসারশূন্য তুচ্ছ সংস্কাবের প্রতি তাঁদের মোহ কাটেনি। 'শ্রীকান্ত' গ্রন্থে রাজলক্ষ্মী হচ্ছে, যাকে বলে এক পতিতাব চরিত্র। সে হচ্ছে শ্রীকান্তেব বাল্যেব প্রণয়িনী। বহুকাল পবে এক জমিদাবের দলে শ্রীকান্তব সঙ্গে তাব সাক্ষাৎ হয়। তখন সে আর রাজলক্ষ্মী নেই,—পিয়ারী বাইজী, একজন গাযিকা ও নটী, ভাবতের সমাজ-জীবনে যাব কোন স্থান নেই। এই পরিবেশের মধ্যে থেকেও সে তার স্বভাবজ পবিত্রতাকে নষ্ট না করায আমরা অবাক হই না, কিন্তু বিস্ময় লাগে তখনি যখন দেখি যে, সে গোঁড়া হিন্দু বিধবাব আচার-অনুষ্ঠানকে পালন করবাব জন্যে ব্যগ্র।

এই বিষয়টিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি হচ্ছে যে, সে তার বিগত জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানকে কঠোরভাবে পালন ক'রে নিজের মনের মধ্যে শান্তিলাভ করতে চায়। এ কথা সর্ববাদীসম্মত যে এই পতিতা ও বারবনিতা শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই খুব কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সংশোধিত পাপী ও অবিশ্বাসীদের উগ্র ও কঠোর ধর্মবিশ্বাস চিরদিনই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা রাজলক্ষ্মী চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ ভুল বোঝা হবে। কারণ শরৎচন্দ্র এই চরিত্রটি অঙ্কিত ক'রে এটিই বোঝাতে চেয়েছেন যে, সকলে তাকে পতিতা নারী মনে করলেও, আসলে সে তার স্বভাবসিদ্ধ পবিত্রতাকে কখনও হারায়নি। একমাত্র কলুষিতা নারীই কঠোর আচারনিষ্ঠার দ্বারা তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়।

'শ্রীকান্ত'র অন্নদা দিদি ও 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রী সম্পর্কে ঐ একই কথা খাটে। তারা সকলেই সামাজিক অপরাধে অপরাধিনী নয়, বরং তারা হচ্ছে বিশুদ্ধ নারীত্বের মহিমময়ী দৃষ্টান্ত। তারা যে অন্তঃসারশূন্য সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারগুলিকে আঁকড়ে থাকতে চায়, তা যে তাদের বিগত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ, এমন মন্তব্য করা চলে না। এটা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যখন আমরা অন্যান্য চরিত্রগুলির বিষয় চিন্তা করি, যাদের জীবনে সামাজিক কলুষ এতটুকু স্থান পায়নি। 'পথের দাবী'র ভারতী, 'শেষ প্রশ্ন'র কমল, 'বিপ্রদাস'-এর বন্দনা, এরা সম্পূর্ণ পৃথক সামাজিক স্তরের চরিত্র। তারা শিক্ষিতা, মার্জিত রুচিসম্পন্না এবং বিগত-জীবন ব'লে তাদের কিছুই নেই। তারা বুদ্ধিমতী, এমন কি সমাজের কোন কোন বৃহত্তম আদর্শ সম্পর্কে তারা বিচারশীল, সন্দেহবাদী। সকল রকম স্বাধীনতা সত্ত্বেও তারা কিন্তু গোঁড়া হিন্দু সমাজের আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারগুলিকে লঙ্ঘন করতে পারেনি। এ্যাংলো-ভারতীয় পরিবারে যে ভারতী খৃস্টানের মত পালিতা, সে শুধু পোশাকে নয়, আচারে-ব্যবহারেও এক গোঁড়া হিন্দু বালিকার মতই হয়েছে। বন্দনা তার সকল শিক্ষাদীক্ষা ও উৎকর্ষ সত্ত্বেও, সকল সময়েই পুরানো ছাঁচে নিজের জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টায় ব্যাপৃত। আর সবচেয়ে অদ্ভুত মনে হয় কমলকে, যাকে শরৎচন্দ্র সকল প্রচলিত রীতি-নীতি ও বিশ্বাসের নির্মম শত্রু

করে গড়েছেন, অথচ যে বাস্তবে নিজের প্রচারের বিরোধিতা করেছে। প্রেমের পূর্ণ স্বাধীনতার পরিপোষিকা এবং ভবিষ্যৎ সমাজের পথিকৃৎ—অনেকের মতে যে হচ্ছে আধুনিক বুলির একটি বস্তাবিশেষ, সেই আবার সবচেয়ে নিজেকে আধুনিকতার বিরোধী করে তুলেছে নিরামিষ আহারের আধ্যাত্মিক মূল্যের অতি-অসঙ্গত স্বীকৃতির দ্বারা।

শরৎচন্দ্রের মধ্যে এই যে রক্ষণশীলতা থেকে গেছে, ভদ্রজীবনের আকাঙ্ক্ষার যুক্তির দ্বারা তা ব্যাখ্যা করলে চলবে না, তার জন্য আমাদের অনুমানকে অন্য দিকে চালিত করতে হবে। তাঁর বর্মার জীবন সম্পর্কে ইতঃপূর্বে যা বলা হয়েছে, সম্ভবতঃ তার মধ্যেই এর যথার্থ সত্যের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যদি সামাজিক বন্ধন না থাকলেই মানুষের সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তি এতটাই বৃদ্ধি পেতে পারে, তাহলে সাধারণ লোকের সম্পর্কে এই বন্ধন কি বাঞ্ছনীয় নয়? স্টীভেনসান বলেছেন, প্রবৃত্তি হচ্ছে সিংহের মত, গৃহের মধ্যে তাকে পোষ মানান যায় না। প্রতিভাধরও হয়ত সেইরূপ সমাজের বিধি-নিষেধের ফলে নিজেকে সম্যক প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু বেশীরভাগ মানুষই সিংহও নয় এবং সিংহ হবার আকাঙ্ক্ষাও করে না। তারা সুখের চেয়ে স্বস্তি চায়, উদ্দাম প্রবৃত্তির চেয়ে গৃহের পরিবেশই বেশী পছন্দ করে। পুরুষের অপেক্ষা নারীর মধ্যে এই গৃহপ্রীতি ও শান্তিকামনা যে অধিকতর প্রবল হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এর একটি কারণ, সমাজ-বন্ধন থেকে বিচ্যুত হয়ে নারীকেই বেশী দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। আর দ্বিতীয় কারণ, নারী অপেক্ষা পুরুষ স্বভাবতই কম সামাজিক এবং অধিকতর আত্মকেন্দ্রিক। প্রকৃতপক্ষে, এর একটি জীববিদ্যা সম্পর্কীয় কারণও থাকতে পারে। প্রজাতির সংরক্ষণে পুরুষের অংশ হচ্ছে আকস্মিক ও ক্ষণিক। প্রবৃত্তির সাময়িক উত্তেজনার চরিতার্থতার পর, এর সামাজিক ফল সম্বন্ধে সচরাচর সে উদাসীন। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে তা নয়। যৌন-চরিতার্থতাই তার প্রবৃত্তির শেষ নয়, তার প্রবৃত্তির পূর্ণ পরিতৃপ্তি তার মাতৃত্বের সার্থকতায়। পুরুষের পক্ষে তার পিতৃত্ব একটা আকস্মিক বস্তু। নারীর ক্ষেত্রে মাতৃত্ব তার যৌন-জীবনের মতই গুরুত্বপূর্ণ। শরৎচন্দ্রের পুরুষ চরিত্রগুলি সকলেই খামখেয়ালী ও অহংসর্বস্ব,

আর তাঁর নারী চরিত্রগুলির অধিকাংশই স্বাভাবিকতা ও কোমলতার আধার। সকল সময়েই তাদের আচরণে মাতৃস্নেহের একটি আবেদন দেখা যায়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের নায়িকারা তাদের প্রেমাস্পদদের জননীর মতই স্নেহ করে। নারী হচ্ছে সমাজের সিমেন্ট-স্বরূপ, আর পুরুষ হচ্ছে তার ইট-পাথর।

নারীর মধ্যে এই যে স্বভাবজ রক্ষণশীলতাবোধ, এর কারণ হচ্ছে সমাজ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের সুতীব্র সচেতনতা। আরও দুটি কারণকে এর পরিপোষক হিসাবে উল্লেখ করা যায়। জীবনে যে পাপ সঞ্চিত হয়েছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করার মানসিক প্রবৃত্তি থেকেই শরৎচন্দ্রের মধ্যে রক্ষণশীলতার ভাব পরিস্ফুট, এ কথা বলা যথেষ্ট নয়। তবে বাধাহীন মানুষের জীবনের সাক্ষাৎ পরিচয় লাভে রক্ষণশীলতার যে বীজ তাঁর মনের মধ্যে উপ্ত হয়েছিল, এ বিষয়টি তাঁর সেই বৃত্তির বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। এটির কার্যকারিতা খুবই সাধারণ, এবং জীবনের অন্যান্যক্ষেত্র থেকেও এটিকে প্রমাণ করা যায়। যারা খুব গুরুতর অপরাধ করে, তারাই আবাব সাধারণ অন্যায় করতে কুণ্ঠিত হয। যাদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে অন্যায় করি, তাদেরই আবাব সামান্য ব্যাপাবে খুশি করাবার চেষ্টা করি। যুক্তির দিক থেকে এর মধ্যে কিছুটা সঙ্গতি আছে। ভীষণ শত্রুর প্রতি জীবনের ছোটখাটো ভদ্রতা প্রদর্শন চিত্তের দুর্বলতারই পরিচয় দেয়। যাকে একবার আঘাত করা যায়, তাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেওয়াই অধিকতর বিচক্ষণতার কাজ হবে। তা সত্ত্বেও এটাই বাস্তবে ঘটে যে, আমাদের বড় বড় অপরাধগুলিকে খণ্ডন করতে আমরা ছোটখাটো ভদ্রতার আশ্রয় গ্রহণ করি। নিরঙ্কুশ নির্মমতাও তেমনি বিরল, যেমন বিরল নিঃস্বার্থ পরোপকার। প্রতি মানুষের জীবনযাত্রাতেই অতি অদ্ভুত অসামঞ্জস্য আচরণের দৃষ্টান্ত মেলে। শরৎচন্দ্রের নাযিকারাও ঐ একই কারণে অযৌক্তিক আচরণ করে। সম্ভবতঃ তাদের ধারণা, তারা যখন মূল নীতির বিরোধিতা করেছে, তখন সামান্য ব্যাপারে নিয়ম মেনে চলতে তাদের কোন আপত্তি নেই।

আর একটি কারণ যার জন্যে শরৎচন্দ্রের রক্ষণশীলতা স্থায়িত্বলাভ করেছে,

তা এই মানসিক অসামঞ্জস্য নয়, তা হচ্ছে তাঁর বিপ্লবাত্মক প্রেরণা। এ বিষয়টি তিনি লাভ করেছেন তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা থেকে। বাহ্যতঃ এটি উদ্ভট মনে হয়, কিন্তু মনুষ্য-সমাজে এরূপ ঘটনা বিরল নয়, এবং মানুষের মনের স্বাধীনতা যতই বাধা পায়, এ বিষয়টিও ততোই উগ্র হয়। যে দেশ পরাধীন, সে দেশে দেশাত্মবোধ অতি সহজেই প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। দেশপ্রেম প্রায়শই সংস্কার-প্রীতিতে পর্যবসিত হয়। নবজাগরণ অজ্ঞাতে পুরাতনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে মিশে যায়। শরৎচন্দ্রের স্বদেশ-প্রীতি ও সামাজিক অন্যায়বোধের অন্তরালে যে রাজনৈতিক দুর্দশার সচেতনতা, তাতে তিনি অজ্ঞাতে প্রচলিত প্রথা ও বিশ্বাসের রক্ষাকর্তা হয়ে পড়েন। তাঁর সজ্ঞান মন আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, কারণ তাবা ব্যক্তিত্ব-প্রকাশের অন্তরায়। তারা তাঁর নিকটে রাজনৈতিক পরাধীনতারই অনুরূপ বলে গণ্য হয়েছে। তাছাড়া তাঁর বিশ্বাস জন্মেছিল যে, রক্ষণশীলতাকে যে কোন এক দিকে ভাঙতে পারলে, অন্য দিকে উন্নতির বেগ দ্রুত হবেই। তা সত্ত্বেও, তাঁর অবচেতন মন পুরাতনকে সোজাসুজি পরিহার করতে পারেনি। তাদের স্বাভাবিক কোন মূল্য না থাকলেও, তাঁর নিকটে তাদের একটা গৌণ মূল্য ছিল। তারা তাঁব নিকট প্রিয় ছিল, কারণ যে স্বদেশ-বাসীদের তিনি ভালবাসতেন তারা ছিল তাদের সামাজিক মনের প্রতীক।

সংস্কারেব প্রতি শরৎচন্দ্রের এই যে অনুরাগ, এর জন্যে তাঁর রচনায় কিছুটা ত্রুটি ঘটেছে, তবে সে ত্রুটি যে অপরিশোধনীয় নয় তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারব। কখনও কখনও তিনি বাংলার সংস্কারের প্রতি মোহ ও আকর্ষণবশতঃ তাঁর নিগূঢ় শিল্পানুভূতির দাবীকে অস্বীকার করেছেন। 'পল্লী-সমাজ'-এ রমেশের প্রতি রমার ভালবাসা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত না হয়ে উপায় নেই, কারণ সে বিধবা, এবং বাংলার রক্ষণশীল সমাজে বিধবার প্রেমের কোন স্বীকৃতি নেই। 'চরিত্রহীন'-এ সাবিত্রীর ভালবাসা ব্যর্থ হয়েছে, ঐ একই কারণে। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারী-চরিত্রের মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমতী ও চিন্তাশীল, উক্ত গ্রন্থে সেই কিরণময়ী সমাজের বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, কিন্তু তার বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে, আর তার প্রেমের তৃষ্ণাও মেটেনি। পরিশেষে,

তার অত্যুজ্জ্বল বুদ্ধির বিলুপ্তি তার চিত্তবিকার ঘটায়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে রাজলক্ষ্মী তার সমস্ত অন্তর দিয়ে শ্রীকান্তকে ভালবাসলেও তার নিকট সে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি, কারণ সে বিধবা এবং সমাজচ্যুতা। অবশ্য, প্রেমকে সার্থক করে তুলতে তাব যে অনিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে, তাকে সে যুক্তির বেদিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে, কিন্তু তার সঙ্কোচ ও ভয় কি সামাজিক বিধি-নিষেধেরই ফল নয়?

বিপ্লবাত্মক প্রেরণা ও রক্ষণশীল অনুক্রমণ শরৎচন্দ্রের সকল চরিত্রে ও রচনায় অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাঁর সমগ্র রচনায় এই দ্বন্দ্বই প্রধান এবং তার জন্যেই তাঁর রচনা আমাদের এত প্রিয়। কারণ, আমরা প্রত্যেকেই ঐ দ্বন্দ্বগুলিব ও অনিশ্চয়তাগুলির অংশ গ্রহণ করি। পুরানো আচার-অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধগুলি আমাদের বিরক্তি উদ্রেক করে এবং সেই কাবণে সেগুলি আমরা পরিহার করতে চাই। কিন্তু সেগুলি পরিহাব কবতে গিয়ে আমরা দেখি যে, আমাদের মধ্যে এমন একটি বস্তু আছে যে তার বিপক্ষতা কবে। ওগুলি আমাদের সত্তার সঙ্গে এমনভাবে বিজড়িত হয়ে আছে যে, ওদের উচ্ছেদসাধন করতে গিয়ে আমরা যেন আমাদেব ব্যক্তিত্বকেই খণ্ডিত কবে ফেলি। আমাদেব প্রয়োজনের তাগিদে আমরা নূতনতর পবীক্ষায় রত হই, কিন্তু সেই পবীক্ষা-গুলির মধ্যেই সংস্কারের স্পর্শ থাকে।

মানুষের মধ্যে এই যে দ্বন্দ্ব, এর বহু অভিধা দেওয়া হয়েছে। সংস্কার ও পরীক্ষা, বৈপ্লবিক প্রেরণা ও রক্ষণশীল অনুবর্তন, যৌবন ও বার্ধক্য এদেব মধ্যে যে বিরোধ, সেটির মূলে এই সত্যই নিহিত যে, মানুষ কালেব দুই পরিসরের মধ্যে বাস করে। তার সমস্ত কার্যই আগমধর্মী, আসলে সে ভবিষ্যৎকালের অধিবাসী। জীবনযাত্রার তাগিদে সে এগিয়ে যায় এবং অন্তরেব বাসনাগুলিকে কার্যে রূপান্তরিত করতে চায়। কিন্তু যে মুহূর্তে সে বাস্তবে অবতীর্ণ হয়, অমনি তার অতীত তার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তখন তার সংস্কার, বিশ্বাস, ভূয়োদর্শন, অভ্যাস সব কিছু তাকে লোহার শৃঙ্খলে বেঁধে অতীতেব হাতে বন্দী ক'রে তুলে দেয়। যে দুঃসাহসিক ও দুর্জয়গতিতে এগিয়ে যেতে পারে, সেই তার অতীতের গুরুভারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই যে দ্বন্দ্ব, এই

দ্বন্দ্বই হচ্ছে মানুষের জীবনের ও ভূয়োদর্শনের সারাংশ। তাই তার বর্ত্তমান হচ্ছে তার অতীত ও ভবিষ্যতের কেন্দ্রস্থল মাত্র।

শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস হচ্ছে 'শ্রীকান্ত', কারণ এই গ্রন্থে এই দ্বন্দ্বটি অতি সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের সূচনাতেই এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছে। ইন্দ্রনাথ—তরুণ, মিশুকে এবং প্রাণবন্ত এক চরিত্র। মানুষের স্বাভাবিক সহজপ্রবৃত্তির সে প্রতীক, জীবনের প্রয়োজনের দাবীতেই সে ছুটে চলে। সামাজিক সংস্কারকে সে পরিহার করে না, সংস্কার সম্বন্ধে তার কোন বোধই নেই। নীতি হচ্ছে একটি সামাজিক প্রত্যয়, এবং ঠিক এই কারণেই, তার কার্যকলাপ কখনও নীতিবিগর্হিত হয় না। সে তার সহজপ্রবৃত্তিগুলির প্রেরণাতেই চালিত হয়, এবং তাদের নৈতিক দিকটা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সেগুলো হচ্ছে তার স্বতঃস্ফূর্ততার অভিব্যঞ্জনা। এই ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তর প্রথম সাক্ষাতে সে যুগপৎ শঙ্কিত ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায়, হয়ত মনের মণিকোঠায় সে এর জন্যে পুলকও অনুভব করে, কারণ এমন কে মানুষ আছে যে গোপনে সংস্কার ও দায়িত্বের কবল থেকে মুক্ত হয়ে নিজের প্রকৃত সত্তাকে অনুভব করতে চায় না?

একটা ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতার শেষে একটা হাঙ্গামায় শ্রীকান্ত যখন বিপক্ষদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে পড়ে, তখন সেখানে প্রথম ইন্দ্রনাথ উপস্থিত হয়। ইন্দ্রনাথ তাকে শত্রুব্যূহের মধ্যে থেকে বার করে আনে এবং তাকে কতকগুলি পাতা দিয়ে চিবুতে বলে, যেগুলি খেলে নেশা হয়। ইন্দ্রনাথ তার বিস্ময়মিশ্রিত অস্বীকৃতি লক্ষ্য না করেই তাকে একটা সিগারেট এগিয়ে দেয়। শ্রীকান্ত দুর্নামের ভয়ে ভীত হয়ে বলে, যদি কেউ তাকে সিগারেট খেতে দেখতে পায়? অতি তুচ্ছভাবে ইন্দ্রনাথ বলে ওঠে, তাতে আর কি হবে; এই ব'লে প্রত্যাখ্যাত সিগারেটটাতে আগুন ধরিয়ে সে পথের ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়। হতভম্ব শ্রীকান্ত কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারে না, ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনে তার মনে কোন্ ভাবটা বড় হয়েছিল; তার সাহসিকতার জন্যে প্রশংসা না প্রকাশ্যে ধূমপান করার জন্যে নিন্দা?

যতবারই ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তর সাক্ষাৎ হয়েছে, ততবারই সে তার

উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতায় ভেসে গেছে। যখন সে একা হয়েছে, তখন তার আচার ও সংস্কার এই সামাজিক উদ্দামতার বিরুদ্ধে তাকে সাবধান করে দিয়েছে। তার সাংসারিক বুদ্ধি ও সম্ভ্রমবোধ তাকে সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে, কারণ সেখানেই আছে তার জীবনের শান্তি, সুখ ও নিরপত্তা। কিন্তু ইন্দ্রনাথ উদ্দামতার প্রতীক, তাই শ্রীকান্তের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর ও ভবঘুরে মানুষটি আছে, সে তার আকর্ষণ থেকে মুক্তি পায়নি। এক সন্ধ্যায় ইন্দ্রনাথ তাকে মাছ ধরতে যাবার জন্য আহ্বান জানায়। শ্রীকান্তর পক্ষে সে আহ্বান উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না, আর এ থেকে যে অভিজ্ঞতা সে লাভ করে, সারা জীবনে সে তা বিস্মৃত হতে পারেনি। অন্ধকার রাত্রি, প্রচণ্ড নদী আর দুর্ধর্ষ বাতাস সব কিছু মিলিয়ে ভয়ঙ্করের এমন একটি বিরাট মূর্তি, এবং প্রকৃতির এমনি একটি সৌন্দর্য তার দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল যে, তার জীবনের গতি চিরতরে ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনাটির পর থেকে সংস্কারের দ্বন্দ্ব যেন শ্রীকান্তর মন থেকে মুছে গেল, স্বাভাবিক সহজপ্রবৃত্তিই তার জীবনে বড় হয়ে উঠল। কিন্তু সংস্কার ও সহজ-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব চিরন্তন, এবং একদিন তাদের মধ্যে অন্নদা দিদি উপস্থিত হয়ে শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথের কবল থেকে রক্ষা করলেন। অন্নদা দিদি হচ্ছেন সংস্কারের প্রতীক, আর ইন্দ্রনাথ সহজপ্রবৃত্তির। অতীতের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস অন্নদা দিদির জীবনের কামনা-বাসনাগুলোকে একেবারে পুড়িয়ে দিয়েছে। ইন্দ্রনাথ যেমন ভবিষ্যতের মধ্যে বাস করে, অন্নদা দিদির অবস্থান তেমনি অতীতের মধ্যে। তাঁর বর্তমান অন্ধকারময়, ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাঁর জীবনের কল্পিত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে তিনি সমাজে নিন্দিতা। কিন্তু এটা তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে সমাজের সম্মান থেকে তিনি বঞ্চিতা হলেও, সংস্কারের কাছে তিনি সম্পূর্ণ খাঁটি। তাঁর সমস্ত জীবনটাই সতীত্বের আদর্শের কাছে এক অবিরাম আত্মাহুতি।

ইন্দ্রনাথ আর অন্নদা দিদি যতদূর সম্ভব, অনাবিল সহজবৃত্তি ও সংস্কারের মূর্তিরূপে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র জটিল, সেই কারণে মানুষের মধ্যে এই দুয়েরই সংমিশ্রণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এবং বোধ হয় এই কারণেই, তারা

অচিরেই আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত হয়ে যায়। শরৎচন্দ্র এটি সহজভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, যদি তারা অধিককাল স্থায়ী হয়, তাহলে তারা তাদের জীবনের এই অনাবিল গুণ দুটিকে বজায় রাখতে পারবে না। খণ্ডচিত্রের মাধ্যমে জীবনের নীতি হিসাবে তাদের প্রকাশ করা চলে, কিন্তু একটি পূর্ণ চিত্রে তাদের রক্ত-মাংসের মানুষ করেই চিত্রিত করতে হবে। সেই কারণে কাহিনীটি পুরানো হবার পূর্বেই অন্নদা দিদিকে মরতে হ'ল, ইন্দ্রনাথ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেল, কারণ সে তার পরিপূরক। অন্নদা দিদির তিরোভাবের সঙ্গে ইন্দ্রনাথেরও প্রকৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

ইন্দ্রনাথ আর অন্নদা দিদির বিলুপ্তি ঘটলেও তাদের প্রভাব রয়ে গেল। সংস্কার ও পরীক্ষার দ্বন্দ্বই এই উপন্যাসখানির মূল প্রবাহ। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীর জীবন এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এই সংঘাতেরই রূপ। কখনও কখনও সংস্কার জয়ী হয়, এবং কখনও কখনও জয়ী হয় জীবনের প্রয়োজন। শ্রীকান্ত ভবঘুরের জীবন গ্রহণ করে, রাজলক্ষ্মী পেশাদারী গায়িকার জীবন গ্রহণ করে। পারিবারিক জীবনের বন্ধন এবং সংস্কারের বন্ধন তাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবকে দমিয়ে রাখতে পারে না। ইন্দ্রনাথও সম্পূর্ণ জয়ী হতে পারে না। প্রেম ও সহজবৃত্তি মুহুর্মুহুঃ শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীকে পরস্পরের সান্নিধ্যে টেনে আনে, কিন্তু সংস্কার ও সামাজিক প্রথার বাধাগুলিকে তারা অতিক্রম করতে পারে না। আকর্ষণ ও বিকর্ষণের টানা-হেঁচড়ায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে তাদের জীবনের প্রেম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সংস্কারের প্রতীক ও আহুতি অন্নদা দিদিই জয়লাভ করে। সম্ভবতঃ অভয়াই হচ্ছে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের একমাত্র নারী, যে অতীতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পেরেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনা একদিকে যেমন তাঁকে বিদ্রোহী করে তুলেছে, তেমনি অন্যদিকে তাঁকে গভীরভাবে উদ্দেশ্যপ্রধান লেখক করে গড়েছে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর সকল রচনার মধ্যেই প্রায় একটা উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁর বিদ্রোহাত্মক অনুপ্রেরণা থাকার জন্যে এটি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাঁর রক্ষণশীলতাও এ ব্যাপারে সহায়তা করেছে। বস্তুতঃ তাঁর রক্ষণশীলতা তাঁর শিল্পকলার সামঞ্জস্য-সাধনে বিশেষ সহায়তা করেছে। সংস্কারের বাসনাই শুধু কোন শিল্পীকে গড়ে তুলতে পারে না, কিম্বা প্রচলিত আদর্শের প্রতি অন্ধ মোহও তা পারে না। উপরন্তু, এদের যে কোন একটিই শিল্পকলাকে প্রচারের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে। প্রাচীনের প্রতি অন্ধ বিতৃষ্ণাপ্রকাশ এবং নূতনের জয়গানে বিভোর হওয়া, এ দুই-ই সংস্কার পর্যায়ভুক্ত। এই সংস্কারের প্রতি আত্মসমর্পণ মানে শিল্পকলার অপমৃত্যু হওয়া, আবার অজ্ঞভাবে প্রথাকে মানাও ঐ একই ফল। শরৎচন্দ্রের রক্ষণশীলতার বিশেষ গুণই তাঁর শিল্পকে বাগ্‌বিতণ্ডার স্তর থেকে রক্ষা করেছে। তাঁর শিল্পযাত্রায় এ বস্তুটিই তাকে স্থিরভাবে চালিত করেছে।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দু'জন সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্বগামীদের তুলনামূলক আলোচনা যেমন আকর্ষণীয় তেমনি সার্থকতাপূর্ণ। সর্ববাদীসম্মতভাবে বঙ্কিমচন্দ্র হচ্ছেন আধুনিক বাংলা উপন্যাসের স্রষ্টা। আর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বহুলোকের মনে কোন সন্দেহ নেই। পথিকৃৎ হিসাবে তাঁর দাবী অনস্বীকার্য, কিন্তু শিল্পী হিসাবে তাঁর মূল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ হওয়া স্বাভাবিক। তিনি যে একজন ঔপন্যাসিক ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু তিনি যে শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ছিলেন তা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় না। কারণ, তাঁর মধ্যে শিল্পীজনোচিত নিস্পৃহতা ছিল না, এবং তিনি তদানীন্তন সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত সংস্কারের নিকট নিজেকে আহুতি দিয়েছিলেন। আরিস্টটলের ভাষায় যাকে বলা যায়, তিনি প্রকৃতিকে অনুকরণ করেননি, তিনি অনুকরণ

করেছিলেন সমসাময়িক জীবন-নীতিকে। তিনি যে দেশবাসীর নিকট এতটা জনপ্রিয় হয়েছিলেন, তার কারণই হচ্ছে এই। এবং এই একই কারণে এত শীঘ্র তিনি এমন পুরানো হয়ে গেছেন যে, আজ তাঁর লেখা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে উদ্দেশ্যপ্রধান লেখক হিসাবে বিবেচনা করতেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নির্দিষ্ট, এবং সেই কারণে সঙ্কীর্ণ। সেদিনের প্রচলিত নৈতিকতাই ছিল তাঁর লক্ষ্য, এবং তার প্রচারের দায়িত্বই যেন তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মধ্যে শৈল্পিক নিস্পৃহতা না থাকায়, যে সব চরিত্র প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তাঁদের প্রতি তাঁর প্রায় ব্যক্তিগত ক্রোধই প্রকাশ পেয়েছে। তাদের তিনি কুৎসিত করে এঁকেছেন, এবং এমন কি তাদের এতটুকু ভাল কিছুই আঁকেননি। আবার যখন তাদের ভাল করে এঁকেছেন, তখন তাদের এতই ভাল করেছেন যে, তারা প্রায় অবিশ্বাস্য হয়ে পড়েছে। মন্দের শাস্তি, ধার্মিকের পুরস্কার এবং ঈশ্বরের কার্যকলাপের উপর বিশ্বাস, এই তিনটি জিনিস ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্যবস্তু।

এই সঙ্কীর্ণ নীতিবোধ বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পকলাকে দু'রকমে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একদিকে, বাঁধাধরা সূত্রের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে তাঁর চরিত্রগুলি অবাস্তব হয়ে উঠেছে। যারা উক্ত সূত্রের সঙ্গে মিলিয়ে চলতে পেরেছে, তাদেরই গ্রহণ করা হয়েছে, আর যারা তা পারেননি তাদের বর্জন করা হয়েছে। এই সূত্রটি কিরূপ প্রাণহীন তার হদিস পাওয়া যায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামক উপন্যাসে, রোহিণী চরিত্রের বিন্যাসে। রোহিণী সুন্দরী, বুদ্ধিমতী এবং কোমলহৃদয়া। সে বালবিধবা, জীবনে ভালবাসার স্বাদ কখনও পায়নি ব'লে ভালবাসার প্রতি তার লোভ আছে, কিন্তু সম্ভ্রমকে বর্জন ক'রে নয়। যখন সম্ভ্রমের সঙ্গে ভালবাসার কোন সম্ভাবনা আর তার নেই, তখনই সে জলে ডুবে মরতে যায়। তখন গোবিন্দলালের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়, এবং তার সঙ্গেই সে গৃহত্যাগ করে। বঙ্কিমচন্দ্র একবারও একথাটা উল্লেখ করেননি যে, ভালবাসার জন্যে সে গৃহত্যাগ করেনি, কিন্তু একবার যখন সে গৃহত্যাগ করেছে, তখন তাঁর দৃষ্টিতে সে পতিতা হয়েছে। আর তার উদ্ধারের উপায় নেই। তার সমস্ত রূপ-যৌবন ব্যর্থ হয়ে

গেছে, সে একটা পতিতারূপে গণ্য হয়েছে।• খুব সুন্দর, ভাবপ্রবণ চরিত্রও পতিতার স্তরে নেমে আসতে পারে, কিন্তু তার সেই অবনতি যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে' হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট কোন যুক্তির প্রয়োজন ছিল না। যে একবাব সামাজিক রীতি লঙ্ঘন কবেছে, তার দ্বারা সব কিছুই সম্ভব। তার পাপের জন্যে তাকে শাস্তি পেতেই হবে, এবং শাস্তির পূর্বে তার সমস্ত মর্যাদা নষ্ট করতেই হবে। বঙ্কিমচন্দ্র কিছুতেই স্থিব হতে পারেননি যতক্ষণ না তিনি রোহিণীকে মেবে ফেলেছিলেন।

এই ধরনের সূত্র-বাঁধা চরিত্র-চিত্রণের ফলে তাঁর সকল নায়ক-নায়িকাই শ্রেণীগত চরিত্র হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রচারক ও সংস্কারকের উদ্দেশ্যসিদ্ধি-সাধনে তাদের সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পকলার দিক থেকে তারা একেবারে অসার। এই কারণেই তাঁব কোন চরিত্রটিই গভীরভাবে আমাদের প্রাণে স্পন্দন জাগায না। এমন কি যখন আমবা তাদের প্রশংসা কবি, তখনও তা আমরা দূব থেকেই কবে থাকি। কিন্তু এই যে বাঁধা-ধরা চরিত্রের সংজ্ঞা, এর কারণ হচ্ছে সমাজ সম্বন্ধেও একটি বদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী। এখানে আমরা তাঁর আর্টের অবনতির দ্বিতীয় কারণটির সম্মুখীন হই। ঈশ্বরেব কার্যকলাপকে লোকের সামনে সত্য ব'লে প্রমাণ কবা খুবই মহৎ কার্য, কিন্তু মুস্কিল এই যে, ভগবানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা সকল সময় নিশ্চিন্ত হতে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক সংস্কারগুলির মধ্যে এই রকম উদ্দেশ্য দেখেছিলেন এবং বিনা দ্বিধায় তাদের গ্রহণ করেছিলেন। সংস্কার তাঁর নিকট পবিত্র বস্তু ছিল, কারণ তা প্রাচীন। ভগবান মানুষের কাছে ঐতিহ্যের মধ্যেই প্রকাশমান। এই কারণে, প্রাচীনের যে ধ্বংস হতে পারে তা বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণারই বহির্ভূত ছিল। নির্দিষ্ট এবং সঙ্কীর্ণ নীতিবোধের ফলে আর্টের সৌন্দর্যহানি না হয়ে পারে না। অধিকন্তু, কোন নির্দিষ্ট রীতির প্রতি অন্ধবিশ্বাস পাঠককে জোর করে গ্রহণ করান হয়। যদি পাঠক এই বিশ্বাসের উপর সন্দিহান না হন, তাহলে তাঁর পক্ষে এর কলাসৌন্দর্যের বিচার সম্ভবপর হয়। কিন্তু যদি তা না হয়, অর্থাৎ যদি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পাঠকের বিশ্বাসের সঙ্ঘর্ষ বাধে, তাহলে তা এড়িয়ে যাওয়া পাঠকের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। বিশ্বাসকে দাবিয়ে রেখে আর্টের

রসগ্রহণ যে একেবার অসম্ভর তা বলা যায় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ তাঁর মতবাদের উপর তিনি ভীষণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেন যে আজ তাঁর আর আদর নেই, তার কারণ হচ্ছে এই যে, তাঁর সময়কার বিশ্বাসগুলি থেকে আজ আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। এবং এটাও একটা কারণ, কেন তাঁর লেখা অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরক্তি উদ্রেক করেছে এবং রচনার সাহিত্যিক মূল্য নিরূপণে বাধা সৃষ্টি করেছে।

অতএব বঙ্কিমচন্দ্র কেবলমাত্র উদ্দেশ্যপ্রধান লেখক ছিলেন না, সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন প্রচারক ও একদেশদর্শী। সকল উচ্চস্তরের শিল্পকলার প্রয়োজনীয় গুণ হচ্ছে উদ্দেশ্য, পক্ষপাতিত্ব নয়। প্রচারের দ্বারা আর্টের মূল সত্তাকে সঙ্কীর্ণতা ও নির্দিষ্টতার সঙ্গে বেঁধে তার ধ্বংসসাধনই করা হয়। শরৎচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে মূলগত অনৈক্য দেখাতে গিয়ে কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, শরৎচন্দ্রের যে-রক্ষণশীলতা, তা ছিল তাঁর আর্টেরই একটি উপাদান, আর বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই ছিলেন রক্ষণশীল। শিল্পীর জীবনে কোন নির্দিষ্ট ছাপ তাঁর ধ্বংসেরই কারণ, এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে যতখানি আমরা এই ছাপের মধ্যে পাই ততখানি তিনি শিল্পীর স্তর থেকে নেমে এসেছেন।

এ ব্যাপারে এবং অন্যান্য ব্যাপারেও রবীন্দ্রনাথের নিকট শরৎচন্দ্রের ঋণ সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁর কৃতজ্ঞতা শরৎচন্দ্র ভাষায় প্রকাশ করতে পারেননি। তিনি প্রায়ই বলতেন, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' তাঁর নিকটে চমৎকারিতার আদর্শ ছিল। তিনি প্রায় পাঠ্য-পুস্তকের মত 'গোরা' পাঠ করেছেন এবং নিজের লেখাকে এরই ধাঁজে গড়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষা যে কিভাবে তিনি গ্রহণ করেছেন এবং তা কাজে লাগিয়েছেন, তা শরৎচন্দ্রের যে-কোন পাঠকের দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার অঙ্গ থেকে সংস্কৃত রূপস্ফীতিকে ছেঁটে ফেলে ভাষাকে গতিশীল ও নমনীয় করে গড়েছিলেন। তাঁর পূর্বেকার আড়ষ্টতা কেটে গিয়েছিল এবং বাংলা ভাষা এক নূতন প্রকাশমাধুর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। শরৎচন্দ্রকে ভাষার ব্যাপারে বিশেষ শ্রমস্বীকার করতে হয়নি, তিনি শুধু তার প্রয়োগের পরিসরকে বিস্তৃত করেছিলেন আর একটা নূতন বাচনিক স্বাচ্ছন্দ্য আবিষ্কার করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের নিকট শুধু ভাষার দিক থেকেই নয, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যেও শরৎচন্দ্র কৃতজ্ঞ ছিলেন। ববীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা দেশে কেউ কেউ সংশয়বাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের প্রভাব ছিল ব্যক্তিগত, সাহিত্যগত নয। মধুসূদন দত্তও বিদ্রোহী ছিলেন এবং সংশযবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন বড কবি, তাই লোকে তাঁব সংশযবাদকে তাঁর কবিজনোচিত অবিশ্বাসেব একটা বস্তু ব'লে মনে ক'রে থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত সংস্কাবের একেবাবে মূল ধ'রে টান দিয়েছিলেন। তাঁব 'চোখেব বালি' এবং 'গোবা'তে, এমনকি তাঁর 'ঘবে-বাইরে' উপন্যাসে তিনি সকল প্রচলিত সংস্কাবের মূল্য নূতন কবে যাচাই কববার চেষ্টা কবেছেন। সামাজিক অত্যাচাবেব মধ্যে যে অন্যায স্বাভাবিক, তার তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন এবং প্রাচীন সংস্কাবেব দ্বাবা পুষ্ট যে সমস্ত বৈষম্য তাদেরও তিনি নিন্দা কবেছেন। এক কথায, ববীন্দ্রনাথ হচ্ছেন বাঙালীব জীবন ও সাহিত্যে আধুনিকতাব অগ্রগামী, আব শবৎচন্দ্র হচ্ছেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য।

রবীন্দ্রনাথেব নিকট থেকেই শবৎচন্দ্র তাঁব শিল্পীজনোচিত নিস্পৃহতা লাভ করেছেন। উভয়েই উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক লেখক, কিন্তু তাঁদেব উদ্দেশ্য প্রচারেব স্তবে নিম্নগামী হয়নি। সজ্ঞান প্রচাব থেকে ববীন্দ্রনাথের নিবাসক্তি অধিকতব প্রকট এবং তাঁব মননশীলতা অধিকতর ব্যাপক। শবৎচন্দ্র তাঁব রক্ষণশীলতাকে তাঁব শিল্পকার্যের ভাবসাম্য হিসাবে প্রয়োগ কবেছেন। কিন্তু ববীন্দ্রনাথেব পক্ষে তাঁর নিজের সোন্দর্যবোধ ব্যতীত আব কোন কিছুবই প্রয়োজন হযনি তাঁব শিল্পকলাব সমতা রক্ষা কবাব জন্যে। তবে, এব যে বিপদ নেই, তা নয়। মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথেব সৃষ্টিতে এমন অবাস্তব চবিত্রেব সন্নিবেশ হয়েছে, যাব জন্যে তারা অন্য জগতেব বাসিন্দা ব'লে মনে হয়েছে। শবৎচন্দ্রেব চবিত্রগুলি সকল সময়েই রক্ত-মাংসেব জীবন্ত নরনাবী। তাবা যেখানেই থাকুক, তাবা আমাদের আত্মীয়তা দাবী করে। যদি তাবা তা কবতে সক্ষম না হয, তাহলে বুঝতে হবে তাদের স্রষ্টার অনুপ্রেবণায কোথায গলদ ঘটেছে। আব রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি ব্যর্থ হয়েছে, যখন তাব চবিত্রগুলি অতিমাত্রায অবাস্তবরূপে প্রকাশ পেয়েছে। শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি এ পৃথিবীর, তাবা পার্থিব।

এই বিষয়টি আরও অন্য এক প্রকারে ব্যাখ্যা করা যায়, যে, শরৎচন্দ্রের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যতই গভীর ও ব্যাপক হোক, শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে তাঁর বাস্তবতাবোধ অধিকমাত্রায় প্রকট। এমন কি যখন তাঁরা উভয়েই একই বিষয়বস্তুকে রূপায়িত করেছেন, অচিরেই এই পার্থক্যটি প্রকাশ পেয়েছে। পরিবারভুক্ত জীবনের ছোটখাটো দ্বন্দ্ব ও মিলন যা বাংলার একঘেয়ে জীবন-যাত্রায় আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাদের আশ্রয় করেই রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র উভয়েই গল্প রচনা করেছেন। এখানে পরিবারই হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু, এবং এই লক্ষ্যবস্তুর অন্তর্ভূত ব্যক্তিদের নানারকম এবং কখনো কখনো বিরোধী স্বার্থের সমন্বয়সাধন করাই গোষ্ঠীর কাজ। তাদের ব্যক্তিগত জীবন আছে, কিন্তু সে জীবনের গতি এত মন্থর যে, স্বাভাবিক অবস্থায় তা অনুভব করা যায় না। অভাব কম, আনন্দ আরও কম। আমাদের সমাজে বৈচিত্র্যের অবকাশ নেই, আর শুধু সামাজিক সম্পর্ক নয়, ব্যক্তিরাও যেন একটা নির্দিষ্ট মান-এ বাঁধা থাকতে চায়। কিন্তু, যেহেতু তারা মানুষ, সেই কারণে ব্যক্তিত্বশূন্যতা কখনই পূর্ণতালাভ করতে পারে না। কখনো কখনো দ্বন্দ্ব ঘটে, পারিবারিক জীবনের শান্তি ব্যাহত হয়। যখনই কোন বিবোধ ঘটে তখনই গুপ্ত পক্ষপাতিত্ব প্রকট হয়। তখন ব্যক্তিদের নূতন ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় এবং পারিবারিক ঐক্য এমনি পথে চিড় খায় যে, বিবেচক পর্যবেক্ষকের পক্ষে তা পূর্বেই অনুমান করা কষ্টকর হয় না। কিন্তু, মানুষের ব্যাপারে সকল সময়েই একটি বুদ্ধিবহির্ভূত বস্তুর প্রকাশ ঘটে। সকল সময়েই ব্যক্তিদের সঙ্ঘবদ্ধতা স্বার্থের সমন্বয়তাবশতঃ ঘটে না, কিম্বা এ ব্যাপারে আমাদের পূর্ব-ধারণাগুলিও কার্যকরী হয় না। অনিশ্চয়তার প্রবেশলাভ ঘটে এবং মানবিক স্বার্থ সামাজিক মূল্যকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অনেক গল্পেই এই একই ধারা পরিলক্ষিত হয়। ব্যক্তিগত খামখেয়ালীর দরুন সামাজিক বা পারিবারিক জীবনের অভ্যাসগত সমতা এবং সুপ্রচলিত ব্যবধানগুলি ব্যাহত হয়। তখন সমস্যার সৃষ্টি হয়, আর তা থেকেই গল্পের সম্ভাবনা প্রকাশ পায়। কারণ, একবার সুঅভ্যস্ত সমাধানগুলি অকর্মণ্য হলে তখন নূতন সংযোজন বা সমতা আসবার চেষ্টার অসংখ্য রকম উপায় উদ্ভাবন করার সুযোগ থাকে।

এই গাঠনিক ঐক্য সত্ত্বেও, শরৎচন্দ্রের বিন্যাসধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের রচনারীতি ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ দ্বন্দ্বকে কল্পনা ক'রে সাধারণভাবে চিত্রিত করেছেন। প্রায়শই একে তিনি ভাব-সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন এবং মানুষের সম্পর্কে সেটাকে একটি গভীর দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতীক হিসাবে গড়ে তুলেছেন। এই কারণে তাঁর গল্পে ঘটনার স্থান স্বল্প এবং তারা যুক্তির ভারে ভারাক্রান্ত। বর্ণনার পরিবর্তে বিশ্লেষণ স্থান পেয়েছে এবং ঘটনার সংস্থান শুদ্ধমাত্র বক্তব্যকে ইঙ্গিতে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। শরৎচন্দ্রের কিন্তু প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, যে দ্বন্দ্ব তিনি রূপায়িত করতে ইচ্ছুক তার সামাজিক সত্তা প্রকাশ করা। তিনিও হয়ত একটি বিশেষ ঘটনাকেই কল্পনা করেছেন, কিন্তু তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে তাকে বাস্তব ও সজীব ক'রে গ'ড়ে তোলা। এই কারণে তাঁর গল্পে ঘটনাগুলির একটি নূতন মূল্য আছে, কারণ তারা তাঁর চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জড়িত। চরিত্রগুলির পারস্পরিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং ভাবসৌন্দর্য ততটুকুই স্থান পেয়েছে—যতটুকু তার দ্বারা ঘটনার প্রকাশ ঘটেছে। এই কারণে বাস্তব মানবতার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যোগ অধিকতর নিবিড় হয়েছে, যদিও চিরন্তন প্রতীকতাকে তিনি হারিয়েছেন।

ছোট গল্প সম্বন্ধে যে কথা সত্য, উপন্যাস সম্পর্কেও তাহাই সত্য। শরৎচন্দ্র আমাদের মনে বিশেষভাবে অঙ্কিত হয়ে আছেন সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেব মধ্যে দিয়ে এবং সামাজিক অন্যায়ের তীব্র প্রতিবাদের মাধ্যমে। অসামাজিক এবং নিষিদ্ধ প্রেমের বিশ্লেষণে, সামাজিক কুসংস্কার ও কপট ভদ্রতার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনায় এবং নরনারীর যৌন-জীবন সম্পর্কে নূতন মূল্য নির্ধারণে তিনি যে সাহস দেখিয়েছেন, তার জন্যে তাঁকে আমরা প্রশংসা করি। কিন্তু প্রতি দিকেই তিনি তাই-ই প্রসারিত করেছেন যা রবীন্দ্রনাথ সূচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর উপন্যাসে প্রেম ও যৌন-সম্পর্কে হৃদয়াবেগ ও সামাজিক বিধিনিষেধ, সংস্কার ও সহজবৃত্তির প্রশ্ন তুলেছেন।

শুধু প্রকাশের রীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীই শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ'কে 'চোখের বালি' থেকে আলাদা করে রেখেছে। 'শেষ প্রশ্নের' বহু সমস্যাই 'ঘরে-বাইরে'

উপন্যাসে পূর্বে কল্পিত হয়েছে, এবং হয়ত অধিকতর নিপুণতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। তবুও, এ কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্রের মত ধ্বংসকারী বলা যায় না। কারণ, রবীন্দ্রনাথের চরিত্রগুলি অধিকতর আদর্শধর্মী ও ব্যাপক। তারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সাধারণ মানবতার প্রকাশ। এবং এই কারণেই স্বদেশে ও বিদেশে তারা সমগুণে ও সমপরিমাণে সমাদর লাভ করেছে। আর শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি অধিকতর সীমাবদ্ধ। তাদের সামাজিক সংযোগ তাদের সত্তার মূলে গিয়ে প্রবেশ করেছে, এবং এই কারণে তাদের মধ্যে একটা বিশেষ জাতীয় ভাব পরিস্ফুট হয়েছে। কোন বিদেশীর পক্ষে তাদের অন্তরের সন্ধান পাওয়া শক্ত, কিন্তু, যদি সেটা তার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে বাঙালীর জীবনের ও চরিত্রের গূঢ়ত্ব তার কাছে সর্বরকমে উদ্ঘাটিত হবে।

অতএব ইহা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে যেটা মূল পার্থক্য, সেটা হচ্ছে তাঁদের শিল্পকলার উদ্দেশ্য-বৈষম্য। রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সৌন্দর্যসৃষ্টি। তিনি প্রথম ও প্রধানোত্তম হচ্ছেন শিল্পী। শরৎচন্দ্রও শিল্পী, কিন্তু তাঁর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক গুরুত্ব। তিনি সামাজিক জীবনের পারস্পরিক সম্পর্কের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চান, এবং তাঁর বিশ্বাস এর দ্বারাই শুধু আর্টের সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে না, মানুষে মানুষে যে সংঘর্ষ, যে বিদ্বেষ, তারও উপশম হবে। একটা গভীর সমাজবোধ শরৎচন্দ্রের রচনাকে সুনিবিড় মানবতার সৌরভে সুরভিত করেছে।

শরৎচন্দ্রের রচনাবলীকে চারিটি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, তাদের উদ্দেশ্যের অনুপাতে। এমন কি যেগুলি বাহ্যতঃ নিছক আর্টধর্মী মনে হয়, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা সেগুলির মধ্যেও গুপ্ত উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে—'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি' বা 'একাদশী বৈরাগী' নামক গল্পগুলি। দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাগুলিতে সামাজিক উদ্দেশ্যের সূচনা প্রকট হলেও, তাদের কাহিনীর গতিবেগ কিন্তু নিজের ছন্দেই ব'য়ে গিয়েছে। তাদের মধ্যে যে উদ্দেশ্য নিহিত তা কাহিনীর সঙ্গেই ওতপ্রোত হয়ে আছে। এই শ্রেণীর নমুনা হিসাবে 'পল্লী-সমাজ', 'শ্রীকান্ত' বা 'চরিত্রহীন'-এর নাম করা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর কাহিনী হচ্ছেঃ 'অরক্ষণীয়া', 'গৃহদাহ' বা

'বামুনের মেয়ে', যেখানে উদ্দেশ্যই প্রধান হয়ে উঠেছে। এদের কাহিনীর মধ্যে উদ্দেশ্যের অস্পষ্টতা নেই, বরং উদ্দেশ্যই এখানে বিশিষ্টতা লাভ করেছে। চতুর্থ শ্রেণীর কাহিনী হচ্ছে ঃ 'পথের দাবী' বা 'শেষ প্রশ্ন'। এদের মধ্যে আর্ট হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রকাশের নামান্তর মাত্র। উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এখানে ভুল হবার কোন সুযোগ নেই, এবং কাহিনী এখানে তার প্রকাশের বাহনরূপে পরিচালিত হয়েছে।

প্রথম শ্রেণীর রচনাগুলির মূল সার্থকতা হচ্ছে মানবীয় সম্পর্কতা। প্রত্যক্ষতঃ এদের মধ্যে কোন সমস্যার ইঙ্গিত নেই, কিন্তু মানুষের পারস্পরিক আচরণের ফলে সমস্যার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। 'একাদশী বৈরাগী'তে একটা সমস্যার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সেটা যে কি তা বলা শক্ত। 'বিন্দুর ছেলে' হচ্ছে এই শ্রেণীর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এর কাহিনীটি পুষ্টিলাভ করেছে অমূল্যর প্রতি বিন্দুর অপরিমেয় ভালবাসাকে কেন্দ্র ক'রে। বিন্দুর নিজের কোন সন্তান না থাকায়, অমূল্যর উপর সে তার সমস্ত স্নেহ অর্পণ করেছে। কিন্তু তার এই ভালবাসার মধ্যে একটা স্বার্থপরতার দিক আছে। তার গর্ব, তার অসহিষ্ণুতা এবং ঔদ্ধত্য-বশতঃ তার স্নেহ একটি অনিশ্চিত ও ভয়াবহ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সে সহ্য করতে পারে না যে অপরে কেউ অমূল্যকে ভালবাসবে বা আদর জানাবে, আর অমূল্যর অপরকে ভালবাসার কথা তো তার পক্ষে আরও অসহ্য। এই অসম্ভব দাবীর ফলে একটা সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের মধ্যে এই উগ্র ভালবাসার ফলে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'ল, তার সমাধান ঘটলো যখন দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে বিন্দুর স্বভাবে এলো পরিবর্তন। এই শ্রেণীর সমস্যা ও সমাধানের মধ্যে যে সামাজিক সার্থকতা আছে তা সুস্পষ্ট, যদিও গল্পের আকর্ষণে আমরা সাময়িক-ভাবে ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনাগুলিতে সামাজিক বন্ধন অধিকতর প্রকট, তবে কাহিনীর মধ্যে থেকে তা বিচ্ছিন্ন করা যায় না। শরৎচন্দ্র শুধু সমস্যা তুলেই ক্ষান্ত হয়েছেন, সমাধানের চেষ্টা করেননি। চরিত্রগুলির জীবনের দুঃখ ও নৈরাশ্যের মধ্যে ছোটখাটো পরিহাসগুলি আমরা অনুভব করি, কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর কাহিনীতে তাদের রূপ দিয়েই সন্তুষ্ট হয়েছেন, সমাধানের কোন চেষ্টা করেননি।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে তিনি প্রেম ও নৈরাশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু কি ভাবে সমস্যাটি সেই অনুধাবনের বেষ্টনীর মধ্যে সমাধান লাভ করবে, সে সম্বন্ধে তিনি মৌন থেকে গিয়েছেন। অন্নদা দিদি সংস্কারকে জীবনেঁ মেনে নিয়ে দুঃখ ভোগ করে কাটিয়েছেন। ইন্দ্রনাথ তার মনের সহজবৃত্তিগুলিকে অনুসরণ করে জীবনে কখনও সুখ পায়নি। শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মী তাদের পরস্পরের প্রেম সম্বন্ধে গভীরভাবে সচেতন, কিন্তু তা সার্থক করে তোলবার কোন পথই তাদের জানা নেই। রাজলক্ষ্মী বিধবা এবং তার উপসন্তানের জননী। বৈধব্যের প্রতি আনুগত্যবশতঃ শ্রীকান্তর প্রতি তার ভালবাসার মধ্যে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। এদের দলের একমাত্র অভয়া ব্যতীত,—যে সামাজিক বিধানকে সম্পূর্ণভাবে তাব জীবনে অস্বীকার করেছে, আর কোন চরিত্র বিদ্রোহ প্রকাশ করবার চেষ্টা করেনি। 'পল্লী-সমাজে' রমেশ-রমার ভালবাসা শেষ পর্যন্ত উপহাসের বস্তু হয়ে উঠেছে। 'চরিত্রহীন'-এর সাবিত্রীকে প্রেমহীন ব্যর্থ জীবনের গুরুভার ব'যে বেড়াতে হয়েছে। চারিদিকে জীবনের এই সব অপচয় ও নৈরাশ্যের বেদনা শরৎচন্দ্রের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করেছে, কিন্তু এর প্রতিকারের বা সমাধানের কোন চেষ্টা তিনি কবেননি। তাঁর শিল্পসৃষ্টি এই সব অনুভব করেই এবং প্রকাশ করেই সন্তুষ্ট হয়েছে—এদের ব্যাখ্যা করতেও চায়নি, নূতন ক'রে গড়তেও চায়নি।

তৃতীয় পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই যে, কি সামাজিক, আর কি ব্যক্তিগত সমস্যা, তাদের সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্র আর শুধু পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশ করেই ক্ষান্ত নন্, এখন তিনি তাদের ব্যাখ্যা করেছেন, তাদের সমাধান করেছেন। পূর্ব্বে মতই নির্যাতিতের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি বর্তমান, কিন্তু এখন তার সঙ্গে একটা বিপরীত ভাব মিশ্রিত হয়েছে। সে ভাবটি হচ্ছে শঠতা ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ-জ্ঞাপন। তাঁর ব্যঙ্গোক্তির তীব্রতা আরও তীব্রতর হয়েছে, কিন্তু তাঁর কোমল হৃদয় পাপ ও পাপীকে একসঙ্গে বাঁধতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের মতই, তাঁর মধ্যেও শিল্পীজনোচিত নিস্পৃহতা থাকায় কলুষ-কালিমার চিত্র-চিত্রণে তাঁর কঠোরতা প্রকাশ পায়নি। 'বামুনের মেয়ে'তে জাতিগত পার্থক্য ও

সম্মানের যুক্তির বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বর্ণাশ্রমধর্মী ব্রাহ্মণের স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে 'কুলীন' হচ্ছে সবচেয়ে বরণীয়। উপন্যাসের নায়িকা সন্ধ্যা খুব উঁচুদরের কুলীন বংশের মেয়ে এবং তার জন্যে তার নিজেরও অহঙ্কার আছে। সে শুধু বংশ-গৌরবেই গৌরবান্বিত নয়, বংশোচিত দায়িত্ব সম্বন্ধেও সে খুব সচেতন। পারিবারিক শুচিতা বজায় রাখার সংস্কারকে সে অবজ্ঞা করতে পারে না। নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে তার রক্তকে কলুষিত করতে পারে না। এই কারণে সে তার বাল্যসাথীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হ'ল। কারণ সে ব্রাহ্মণ হলেও অধিকতর নিম্নশ্রেণীভুক্ত। তার নিজের তরফে প্রেমের মৃত্যু ঘটেনি, কিন্তু যে উচ্চবংশীয়া তার পক্ষে প্রেমের জন্যে বিবাহ করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে মর্যাদা ঢের বড়। তারই মত উচ্চবংশের এক কুলীনের সঙ্গে তার বিবাহের ব্যবস্থা হ'ল। বয়সের দিক থেকে পাত্রটি তার পিতামহ হবার যোগ্য, কিন্তু সে বিবাহের কোন মূল্য নেই। হোক্ সে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, কিন্তু তার ধমনীতে তো উচ্চবংশের রক্ত প্রবাহিত। কিন্তু সন্ধ্যার ভাগ্যে একটা মর্মন্তুদ পরিহাস ঘটে গেল। সে তার বাল্যসঙ্গীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কারণ সে তার অপেক্ষা বংশমর্যাদায় হীন, কিন্তু তার বিবাহের রাত্রে সে জানতে পারলে যে, বংশমর্যাদা ব'লে কোন কিছু তার নিজেরই নেই। তার পিতামহ যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন-বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর বহু স্ত্রী বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়ান ছিল। তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়ের অভিভাবকেরা গর্ব অনুভব করতেন। লোকের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তিনি বিবাহকে একটা পেশা বলে গ্রহণ করেছিলেন। এর দ্বারাই তাঁর জীবিকাঅর্জন হ'ত। তাঁর বেশীর ভাগ স্ত্রী-ই তাঁকে বছরে একবার দেখতে পেতেন, যখন তিনি তাঁর বার্ষিকী আদায় করতে একবার চারদিক ঘুরতে বেরুতেন। বয়স যখন বেশী হ'ল, তখন আর তাঁর পক্ষে দূরের স্ত্রীদের বাড়িতে যাওয়া সম্ভব হ'ল না। তিনি একজন প্রতিনিধি পাঠাতেন, এই বিশ্বাসে যে, লোকেরা তো তাঁকে বছরে একবার মাত্র দেখেছে, অতএব তারা একে চিনতে পারবে না। এই প্রতিনিধিটি ছিল জাতিতে নাপিত, হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্মের সর্বনিম্নশ্রেণী পর্যায়ভুক্ত। সে স্ত্রীদের

সঙ্গে সাক্ষাৎ করত এবং বার্ষিকী আদায় করত। তার উপর খুব কড়া আদেশ ছিল, কিন্তু মানুষের রক্তমাংসের শরীর দুর্বল, আর তার উপর সন্ধ্যার মাতামহী পরমাসুন্দরী। একটা দুর্নাম রটেছিল, কিন্তু ইতোমধ্যে সন্ধ্যার পিতার জন্ম হয়েছিল। ব্যাপারটিকে চাপা দেওয়া হয়েছিল, হতভাগিনী পিতামহী ম'রে জুড়িয়েছিলেন আর পরিবারটি অন্যত্র গিয়ে বসবাস করেছিল। বিবাহের রাত্রে সন্ধ্যা এই ঘটনাটি জানতে পারে। উচ্চবংশ ও সামাজিক মর্যাদায় গর্বিতা সন্ধ্যা শেষে কিনা জানতে পারল যে, সে এক দরিদ্র নাপিতের জারজ বংশজাত! ভাগ্যের চরম পরিহাসই বটে!

এই শ্রেণীর রচনাতে শরৎচন্দ্রের আর্টের স্তরে ভাঙনের আভাস দৃষ্ট হয়। সন্ধ্যার ভাগ্যের মধ্যে একটা অবিশ্বাসের বস্তু থেকে গেছে। তার জীবন-বৃত্তান্তকে একেবারে অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ এর চেয়েও অদ্ভুত ঘটনা জীবনে ঘটে। বস্তুতঃ, এর স্বপক্ষে এমন কথাও শোনা গেছে যে, এ কাহিনীটি প্রকৃত বাস্তব ঘটনারই অনুসরণে রচিত। এ কথা বলার কোন সার্থকতা নেই, কাবণ ঘটনাকে আর্টের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে কল্পনাকে তার উপর সম্ভাবনার আস্তরণ বিস্তার করতে হয়। তবুও এই শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক তত্ত্ব ও আর্টের মধ্যে একটা সমন্বয়সাধন করবার চেষ্টা আছে। অনেকের মতে, এই শ্রেণীর কাহিনীব মধ্যে 'গৃহদাহ' হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা।

শরৎচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে কোথাও কোথাও আর্টের নামগন্ধও নেই। শেষ পর্যায় বলতে যুক্তির পর্যায় বলতে চাইছি, সময়ের ধারাকে নয়। এই পর্যায়ের রচনায় বক্তব্যই প্রধান এবং তার মধ্যে একটা নূতন নির্বন্ধাতিশয্য বর্তমান। আর্ট প্রচারের স্তরে অধোগতি লাভ করার উপক্রম করেছে, যদিও শরৎচন্দ্রেব শিল্প-নৈপুণ্য থেকে রচনাগুলি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়নি। শরৎচন্দ্রের শিল্পচাতুর্যের এটি একটি অদ্ভুত গুণ যে, তাঁর এই পর্যায়ের রচনাগুলি পূর্ণমাত্রায় মতবাদধর্মী হওয়া সত্ত্বেও পাঠকের মনে তাদের আকর্ষণ হ্রাস পায়নি। এর দুটি কারণ দেখা যায়। তিনি এমনি বিষয়বস্তু মনোনয়ন করেছেন যা পাঠকদের মনে জ্বলন্ত হয়েছিল এবং তাদের বিন্যাসে তিনি তাঁর অন্তরের সমস্ত দরদ ও একাগ্রতাকে ন্যস্ত করেছেন। একদিকে গল্পের আকর্ষণে

অনেক ত্রুটি আর চোখে পড়ে না, অন্যদিকে প্রকাশের আন্তরিকতা বিরুদ্ধতাকে নিস্তেজ করে দেয়। আর একটা কথা, তিনি কখনও তাঁর শিল্পীজনোচিত নিস্পৃহতাকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেননি, যদিও অনেকক্ষেত্রে তা ভীষণ-ভাবে শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। উপরন্তু, তাঁর বিন্যাসধারাকে আকর্ষণীয় করবার জন্যে তিনি তাঁর অগ্রসরণের মধ্যে যুক্তিকে প্রয়োগ করেছেন। 'শেষ প্রশ্ন'র কমল প্রতিহিংসাপরায়ণ রূপেই আধুনিকী। সে উন্নয়নের পক্ষপাতী এবং তার সমস্ত ধারণাই সামাজিক উন্নয়নের সমসাময়িক যুক্তিগুলির সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়। এক বিদ্রোহীর কার্যকলাপকে কেন্দ্র করেই 'পথের দাবী' রচিত। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনবার তার যে চেষ্টা তার প্রতি স্বভাবতই ভারতীর মন সহানুভূতিশীল। এই ধরনের চরিত্রগুলি রোমান্টিক। তারা অহর্নিশি মৃত্যুর আতঙ্কের মধ্যে বাস করে এবং তাদের একটা গুপ্ত-জীবন থাকে। এ অবস্থায় তাদের বিচার-শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। গ্রন্থকার অনেক কিছুই ব'লে যেতে পারেন যা তাঁর অধিকতর সজাগ মন বলতে পারবে না। 'পথের দাবী' বা 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে পাঠকের লক্ষ্যই থাকে না কি ভাবে গ্রন্থকারের কল্পনার বেগ মন্থর হয়ে গেছে। চরিত্রের বোধ বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অপ্রাকৃত ও অভিসন্ধিমূলক হয়ে উঠেছে। এই প্রথম আমরা শরৎচন্দ্রের রচনাতে এমন সব চরিত্রের সন্ধান পাই, যারা পূর্ণমাত্রায় মন্দ। এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলি সহজেই প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাগুলিরও তাই হয়েছিল। তবে কি এগুলিও কালে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীরই ভাগ্য লাভ করবে?

চতুর্থ অধ্যায়

সূক্ষ্ম কল্পনাশক্তি ও জীবনের বহু রকমারি অভিজ্ঞতা শরৎচন্দ্রকে বিপ্লবাত্মক ও উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক লেখক করে তুলেছিল। তাছাড়া, এদের দ্বারা তিনি লাভ করেছিলেন মানুষের মর্যাদা সম্বন্ধে একটা নূতন চেতনা। অত্যন্ত বাল্যকালে বিভিন্ন সামাজিক স্তরের সংস্পর্শে এসে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষের সত্যকার মূল্য নিরূপণে সামাজিক বিচারে কি মারাত্মক ভুল হয়। সমাজের এক স্তরে যেটা অপরাধ হিসাবে গণ্য নয়, এমন কি যা প্রশংসার্হ, অন্য স্তরে সেটাই অপরাধ হিসাবে নিন্দিত। বর্মায় থাকাকালে তিনি দেখেছিলেন যে, সামাজিক বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের মধ্যে শুধু মন্দই প্রকাশ পায়নি, তার চরিত্রের অনুপম মাধুর্যও বিকশিত হয়েছে। তিনি এটাও দেখেছিলেন যে, মানুষের সামাজিক সম্পর্ক্যগুলো তার কতখানি বাহ্যবস্তু। তারা কত সাময়িক এবং কত সহজে তারা বর্জিত হয়। তাঁর মধ্যে এই বোধটাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, মানুষের বিচারে মানুষটাই সব, তার সামাজিক ছাপটার কোন মূল্য নেই।

শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহাত্মক মনের একটা নিদর্শন হচ্ছে, সমাজপরিত্যক্ত ও নির্যাতিতদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি। তিনি সকল সময়েই দুর্বলের পক্ষ সমর্থন করেছেন। যে পরাজিত—বিজয়ী নয়, সেই তাঁর চিত্তহরণ করেছে। সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসার এটা একটা দিক মাত্র। সাধারণ মানুষের মধ্যে শক্তিও আছে, দুর্বলতাও আছে; দোষও আছে, গুণও আছে। এমন কি তার নীতিও নঞর্থক, কারণ, যদি সে অন্যায় না ক'রে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে অন্যায় করবার সুযোগ তার ঘটেনি। যারা পতিত, তাদের ব্যতিক্রমের জন্যে নিন্দা না করে, তাদের দুর্বলতার জন্যে তাদের প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল হওয়া কর্তব্য। এমন কি তারা যদি যথার্থই নিন্দার যোগ্য হয়, তাহলেও আমাদের মধ্যে কে এমন নিষ্কলুষ আছে, যে পাপীর প্রতি প্রথম ঢিল ছোঁড়ার স্পর্ধা রাখে? ভ্রান্ত এবং নির্যাতিত মনুষ্যত্বের প্রতি

অপরিসীম করুণা ও সহানুভূতি শরৎচন্দ্রের সমস্ত রচনার মধ্যে ফল্গুধারার মত প্রবাহিত।

নৈষ্ঠিক হিন্দু সমাজে, সম্ভবতঃ পৃথিবীর সকল নৈষ্ঠিক সমাজেই, যে নারী যৌন-নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে, সমাজে আর তার স্থান নেই। শরৎচন্দ্রই, সম্ভবতঃ বাংলা দেশের প্রথম লেখক যিনি ঘোষণা করেছেন যে, নারীর দৈহিক সতীত্ব ও মানবিক মহত্ত্ব সমার্থসূচক নয়। পুরুষের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি সর্বত্র স্বীকৃত এবং পুরুষের পদস্খলনের প্রতি সকল সমাজেই একটা করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপিত হয়। পুরুষ চিরকালের জন্যে নিন্দিত হয় না, যেহেতু সে প্রবৃত্তির উদ্দাম তাড়নাকে দমন করতে পারেনি,—তা সে পিতৃত্বের লোভেই হোক বা বংশধারা বজায় রাখার লোভেই হোক ; কিন্তু নাবীব ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। দৈহিক সতীত্বই তার মূল্য বিচারের একমাত্র পরীক্ষা হিসাবে গণ্য হয়েছে, তা তার অন্যগুণ যত রকমেই থাকুক না কেন, তাদেব কোন মূল্য নেই যদি যৌন-জীবনে তার একবার স্খলন ঘটে। কোন পুরুষেব ধৃষ্টতা বা বিশ্বাসঘাতকতাকে আমরা বরদাস্ত কবি না যেহেতু সে যৌন-জীবনে পবিত্র। বরং কলহপ্রিয় দাম্ভিকের চেয়ে হৃদয়বান্ লম্পটকেই আমরা বেশী পছন্দ কবি। শরৎচন্দ্র নারী-চরিত্রের ব্যাপারেও এই নীতিকেই অনুসরণ করেছেন। তিনি বহুক্ষেত্রে এ কথা প্রচার করেছেন যে, পুরুষের বিচারে আমবা যে নীতি অনুসরণ করি, নারীর বিচারেও সেই নীতিই পালন করা বাঞ্ছনীয়। আমরা কি এটা লক্ষ্য করি না যে, কত নারী ধর্ম ও মর্যাদাব গর্ব করে, অথচ আশ্রিতদের প্রতি নীচ ও হিংসাত্মক ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না, এবং সামাজিক ব্যাপারেও স্বার্থপর ও অর্থগৃধ্নু। সমাজে ধার্মিকদের মধ্যেও কলহ-পরায়ণ ব্যক্তির অভাব নেই, তা সে কি পুরুষ আর কি নারী! শরৎচন্দ্র নারী-চরিত্রের অন্য দিকটাই আমাদের দেখিয়েছেন, যারা সমাজকর্তৃক পরিত্যক্তা কিন্তু কোমলতায় ও সৌন্দর্যে যারা অনুপমা।

শরৎচন্দ্রের বিপ্লবাত্মক প্রেরণা দুটি দিকে তাঁর সহানুভূতি ও কল্পনাকে প্রসারিত করেছে। এর জন্যেই তিনি তাদের মধ্যে মূল্য ও মর্যাদার সন্ধান করেছেন যারা সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছে। এমন কি যারা লম্পট,

গণিকা, ভবঘুরে এবং মদ্যপায়ী তাদের চরিত্রেও স্বাভাবিক মহত্ত্ব আছে। অনুকূল অবস্থার সুযোগ পেলে তারাও এত উচ্চে উঠতে পারে, যা দেখে আমাদের মানবিক অনুভূতিগুলি বিস্ময়ান্বিত ও পুলকিত হ'য়ে উঠবে। যদি পতিতা ও সমাজপরিত্যক্তাদের মধ্যে গুপ্ত মহত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়, তাহলে নিম্নস্তরের সমাজ-জীবনের নরনারীদের মধ্যে যে তা থাকবে তাতে আর সন্দেহ কি! খুব সম্প্রতিই সাহিত্যে তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতিলাভ করেছে। অতীতে তারা ছিল শুধু সামাজিক যন্ত্রপাতির অংশবিশেষ। নায়ক-নায়িকাদের প্রয়োজন মেটাবার যন্ত্রস্বরূপ আর্টের পবিত্র সীমানার মধ্যে তারা প্রবেশের অনুমতি পেয়েছে, কিন্তু তাঁদের মানবিক বৈশিষ্ট্য কোথাও প্রকাশ পায়নি। এ ব্যাপারেও শরৎচন্দ্রই বোধ হয় বাংলা দেশের সর্বপ্রথম লেখক যিনি সামান্য অবস্থার নরনারীদের চরিত্র চিত্রিত করেছেন, এবং তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকার ক'রে, তাদের মধ্যে উন্নততর মানুষের মতই, সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্যের ভাব আরোপ করেছেন।

এই দুটি দিকেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে চার্লস্ ডিকেন্সের অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উভয়েই নিম্নতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ছিলেন, এবং উভয়েই তাঁদের শ্রেণীগত জীবন থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন। দু'জনারই রচনা সর্বোৎকৃষ্ট হয়েছে, যখনই তাঁরা তাঁদের নিজেদের সামাজিক জীবনের মানুষের ছোটখাটো আশা-নিরাশার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁরা দু'জনেই তাঁদের শ্রেণীগত সীমানা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন, যখন তাঁরা আরও নিম্নতর সমাজ-জীবনের চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু তাঁরা দু'জনেই ব্যর্থ হয়েছেন তাঁদের উন্নততর সমাজ-জীবনের চিত্রাঙ্কনে। সমাজের বিপথগামী ও ছন্নছাড়াদের প্রতি একটা বিশেষ অনুকম্পা উভয়ের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করেছে। উভয়েই দরিদ্র-জীবনের মানুষের চরিত্র-চিত্রণে অধিকতর উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। উভয়েরই বাণী হচ্ছে: মানুষের মূল্য বিচারে সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। নিম্নতম মানুষের মধ্যে কত বড় মহত্ত্ব ও সহৃদয়তা সুপ্ত থাকতে পারে তার পরিচয় দু'জনেই লিপিবদ্ধ করেছেন। ডিকেন্সের 'A tale of two cities' উপন্যাসে সীড্‌নী কার্নটন হচ্ছে একটি লম্পট ও দুশ্চরিত্রের চরিত্র।

'David Copperfield' উপন্যাসে পীগটী হচ্ছে এক দাসীর চরিত্র। শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথ হচ্ছে এক ভবঘুরে এবং সতীশ হচ্ছে এক দুশ্চরিত্র। সাবিত্রী শুধু পতিতাই নয়, নিম্নতম সামাজিক শ্রেণী থেকেই তার উদ্ভব।

শরৎচন্দ্রের তীক্ষ্ণ মানবতাবোধ ও মানুষের মর্যাদাবোধ দেশের নব-অভ্যুদয়িত গণতান্ত্রিক ভাবধারার একটা দিক হিসাবে বলা যায়। কি কি কারণে এই গণতান্ত্রিকতার অভ্যুদয় ঘটেছে সে-বিচারে আমাদের এখানে প্রয়োজন নেই। শুধু এই কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, এটা যে ঘটেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে এই ভাবটি অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছিল যেহেতু তিনি সাহিত্যকে তাঁর পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের উপর নির্ভরতাবশতঃ যে-কথা আমরা পূর্বেই বলেছি, সাধারণ মানুষের একটা নূতন ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করতে হয়েছে। শরৎচন্দ্র ও ডিকেন্সের মধ্যে এ-ও আর একটা সৌসাদৃশ্য। এঁদের দু'জনকেই নূতন করে মানুষকে আবিষ্কার করতে হয়েছে, শুধু তাদের বিপ্লবাত্মক প্রেরণা বা গণতান্ত্রিক অনুভূতির প্রভাবেই নয়, তাঁদের আর্টের কর্মক্ষেত্রের দাবীতেও।

এই কারণে একদিক থেকে শরৎচন্দ্র রোমান্টিক লেখক। সুপরিচিত অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে তিনি নূতন ঔৎসুক্য ও সুষমা আবিষ্কার করেছেন। মানব মনের অসংখ্য বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়ে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছেন। এর কার্যবিধি জীবনের সূচনার মতই রহস্যময়, এবং সে রহস্য পরিচয়ের দ্বারা বিলুপ্তি হয় না। এর অতি-সান্নিধ্যই আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করে এবং সুদূর নক্ষত্ররাজির মত আমাদের অগম্য হয়ে থাকে।

এই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে শরৎচন্দ্রের রচনার একটা ত্রুটির কথা শোনা যায়। যারা সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে, তাদেরই যেন তিনি বিশেষ গৌরবান্বিত করেছেন। তাঁর সমস্ত নায়ক-নায়িকাই সমাজের ছন্নছাড়াদের সমগোত্রীয়। তারা সব এমনি চরিত্র, যাদের সঙ্গে আমাদের জীবনে পরিচয়ের কোন সুযোগ ঘটেনি। হয়ত হাজার বছরের মধ্যে একবার সাবিত্রীর মত একজন নারী তার ঐ সামাজিক ও ব্যক্তিগত পরিবেশের মধ্যে জন্মাতে

পারে। অন্নদা দিদি বা কমল তো আরও বিরল। অথচ শরৎ-সাহিত্যে এদেরই আমরা বারে বারে দেখতে পাই। এর দ্বারা কি জীবনের মিথ্যাকেই প্রচার করা হচ্ছে না এই ধারণা সৃষ্টি করে, যে এই সব অনুপম চরিত্র জন্মগ্রহণ করতে পারে এমনি নিন্দিত পরিবেশের মধ্যেই? যেমন শতদলের মূল থাকে বিশ্বাসঘাতী কর্দমে প্রোথিত?

যদি প্রকৃতই চরিত্রগুলি অবাস্তব হয়ে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের স্বপক্ষে কিছু বলবার নেই। কিন্তু যদি তাঁর কল্পনা তাঁর চরিত্রগুলিকে জীবনী-শক্তিতে উদ্দীপিত করে থাকে, তাহলে এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর যে তাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা যায় কিনা, বা তারা অতি-মানবের দলভুক্ত। কিন্তু একথা মানতেই হবে যে, শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ চরিত্রই এমনি প্রাণবন্ত যে তারা শুধু আমাদের স্মৃতিতেই জাগরূক নয়, তারা আমাদের কল্পনা ও অন্তরকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

তাঁর জীবনের ভূয়োদর্শন এমনই গভীর, এমনই ব্যাপক যে তার জন্যেই তাঁর চরিত্রগুলি বাস্তব হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর নিষ্ঠা ও সাহস যুগপৎ আমাদের আনন্দ ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তাঁর সৃষ্টির তেজস্বিতা ও উদ্যমশীলতার গতিবেগে আমরা ভেসে যাই এবং আমাদের ভাববার সুযোগই ঘটে না যে, তাঁর চরিত্রগুলি যথার্থই বাস্তবের অনুরূপ হয়েছে কিনা। তাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আমাদের অন্তরে গিয়ে বিদ্ধ হয়, এবং আমরা তাঁর চরিত্রগুলির সঙ্গে মিশে যাই। তাঁর সহৃদয়তা ও সহানুভূতি আমাদের হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীতে গিয়ে আঘাত করে এবং তাঁর ত্রুটিগুলি আমাদের আর দৃষ্টিগোচর হয় না। শরৎচন্দ্র যে বাংলা দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখক, এ কি এমনিই হয়েছে! বাংলা দেশ তাঁকে সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছে এবং তাঁর চেয়ে আর কারুকে সে এত ভালবাসতে পারেনি। তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে যে ত্রুটি আছে, তাঁর কল্পনা যে স্থানে স্থানে দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাঁর মধ্যে যে ভাববিলাসিতা স্থান পেয়েছে, মাঝে মাঝে বুদ্ধির দৃপ্তিতে যে তাঁর বিচারবোধ ঘোলাটে হয়ে গেছে, এ সবই সত্য। কিন্তু তাঁর এ সব ত্রুটির কথা আমরা ভুলে যাই, বাংলা দেশ ও তার জনসাধারণের প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর দরদের কথা ভেবে।

সত্যিই তিনি বাংলা দেশকে ভালবেসেছিলেন, আর বাংলা দেশও তাঁকে তেমনি ভালবেসেছে।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এটাই বোধহয় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি নূতন করে বাংলা দেশকে আবিষ্কার করেছিলেন সাধাবণ মানুষের জন্যে এবং সেই আবিষ্কারের মধ্যে সাধারণ মানুষ অসাধারণ হযে উঠেছে। তাঁর মধ্যেই প্রথম উদ্ঘাটিত হয়েছিল কি বিবাট উন্নতির সম্ভাবনা নিহিত আছে সাধারণ মানুষেব মধ্যে। তিনিই প্রথম এটা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বাঙালী জীবনের বাহ্যিক একঘেয়েমির অন্তরালে প্রেম ও বিতৃষ্ণা, আশা ও নৈরাশ্য, সুখ ও দুঃখ কি ভাবে প্রচ্ছন্ন আছে। শরৎচন্দ্র যদি এ ছাড়া আর কিছুই না করতেন, তাহলেও তাঁর স্থান বাংলার সভ্যতার ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকত।

পরিশিষ্ট

শরৎচন্দ্রের জীবন-সূচী

জন্ম—ইং ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬; বাংলা ৩১শে ভাদ্র ১২৮৩; অশ্লেষা নক্ষত্রে, ত্রয়োদশী তিথিতে।

জন্মস্থান—হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে, পিতার মাতুলালয়ে।

বংশ-পরিচয়—পিতা: মতিলাল চট্টোপাধ্যায়; মাতা: ভুবনমোহিনী দেবী। মতিলালের তিন পুত্র, দুই কন্যা। কন্যা অনিলা জ্যেষ্ঠা, শরৎচন্দ্র মধ্যম। শরৎচন্দ্রের জন্মের কয়েক বৎসর পরে দেবানন্দপুর গ্রামে মতিলালের নিজস্ব বাসভবন নির্মাণ।

বিদ্যার্জন—প্রথমে গ্রামের পাঠশালায, পরে দশ বৎসর পর্যন্ত গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালযে। বিহার অঞ্চলে পিতার কর্ম উপলক্ষে দেবানন্দপুর গ্রাম ত্যাগ ও ভাগলপুরে মাতুলালয়ে বাস। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্যলাভ ও এক বৎসর কাল তেজনারায়ণ কলেজিয়েট স্কুলে পাঠ। পিতার কর্মত্যাগবশতঃ দেবানন্দপুরে প্রত্যাবর্তন, এবং হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দেব মাঝামাঝি সময়ে সাংসারিক দুরবস্থাবশতঃ পুনরায় দেবানন্দপুর ত্যাগ, ভাগলপুরে মাতুলালয়ে গমন ও পূর্বেকার স্কুলে ভর্তি হওয়া। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স (প্রবেশিকা) পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া ও তেজনারায়ণ কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী পর্যন্ত পড়া। কলেজের টেষ্ট-পরীক্ষার সময়ে কলেজ ত্যাগ ও ছাত্রজীবনের অবসান।

সাহিত্য-সাধনা—দেবানন্দপুরে থাকা কালে ১৫ বৎসর বয়সের মধ্যেই সাহিত্য-রচনার সূত্রপাত। যথা: 'কাকবাসা' (বিনষ্ট), 'ব্রহ্মদৈত্য' (বিনষ্ট) ও 'কাশীনাথ'। ছাত্রাবস্থায় ভাগলপুরে "ছায়া" নামক হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকায় লেখা। এই সময়ের গল্প-উপন্যাস: 'অভিমান' (বিনষ্ট), 'বড়দিদি', 'দেবদাস' ও 'শুভদা' (শেষোক্তটি মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)। প্রথম মুদ্রিত গল্প:

ইং ১৯০৩, বাং ১৩০৯ সালে 'মন্দির' (কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত)। প্রথম মুদ্রিত উপন্যাস : "ভারতী" মাসিক পত্রিকায় (বৈশাখ, আষাঢ়, বাং ১৩১৪, ইং ১৯০৭) 'বড়দিদি'। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ ভাগ্যান্বেষণে ব্রহ্মদেশ যাত্রা করায়, সাহিত্যসৃষ্টিতে সাময়িক বিরতি ঘটে। শরৎচন্দ্রের নিজের মতে, তাঁর সত্যিকার সাহিত্যিক-জীবন বলতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ থেকে রেঙ্গুনে থাকা কালে "যমুনা" মাসিক পত্রিকার মারফত আরম্ভ হয়। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুন থেকে ফেরবার পর "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত লেখা দেওয়া। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি-লিট্' বা সাহিত্যাচার্য উপাধি লাভ।

মৃত্যু—বাংলা ২রা মাঘ, '১৩৪৪ ; ইং ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৩৮।

শরৎচন্দ্রের রচনাবলী

	উপন্যাস	প্রকাশকাল		উপন্যাস	প্রকাশকাল
১।	বড়দিদি	... ১৯১৩ ইং	১৪।	দেবদাস	... ১৯২০ ইং
২।	বিরাজ বৌ	... ১৯১৪ "	১৫।	গৃহদাহ	... ১৯২০ "
৩।	পরিণীতা	... ১৯১৪ "	১৬।	বামুনের মেয়ে	... ১৯২০ "
৪।	পণ্ডিত মশাই	... ১৯১৪ "	১৭।	দেনা-পাওনা	... ১৯২৩ "
৫।	পল্লী-সমাজ	... ১৯১৬ "	১৮।	নববিধান	... ১৯২৪ "
৬।	চন্দ্রনাথ	... ১৯১৬ "	১৯।	পথের দাবী	... ১৯২৬ "
৭।	বৈকুণ্ঠের উইল	... ১৯১৬ "	২০।	শ্রীকান্ত, ৩য় পর্ব	... ১৯২৭ "
৮।	অরক্ষণীয়া	... ১৯১৬ "	২১।	শেষ প্রশ্ন	... ১৯৩১ "
৯।	শ্রীকান্ত, ১ম পর্ব	... ১৯১৭ "	২২।	শ্রীকান্ত, ৪র্থ পর্ব	... ১৯৩৩ "
১০।	নিষ্কৃতি	... ১৯১৭ "	২৩।	বিপ্রদাস	... ১৯৩৫ "
১১।	চরিত্রহীন	... ১৯১৭ "	২৪।	শুভদা*	... ১৯৩৮ "
১২।	দত্তা	... ১৯১৮ "	২৫।	শেষের পরিচয়	... ১৯৩৯ "
১৩।	শ্রীকান্ত, ২য় পর্ব	... ১৯১৮ "		(অসম্পূর্ণ রচনা, পরে অন্যের দ্বারা সম্পূর্ণ)	

গল্প	প্রকাশকাল
১। বিন্দুব ছেলে	··· ১৯১৪ ইং

(বিন্দুব ছেলে, রামেব সুমতি ও পথ নির্দেশ)

২। কাশীনাথ	··· ১৯`৭ ইং

(কাশীনাথ, আলোছায়া, মন্দির, বোঝা, অনুপমাব প্রেম, বাল্যস্মৃতি ও হবিচবণ)

৩। স্বামী	··· ১৯১৮ ইং

(স্বামী ও একাদশী বৈবাগী)

৪। ছবি	··· ১৯২০ ”

(ছবি, বিলাসী ও মামলাব ফল)

৫। অনুবাধা, সতী ও পবেশ ··· ১৯৩৪ ইং

৬। ছেলেবেলাব গল্প* ··· ১৯৩৮ ”

(লালু, ছেলেধবা, কলকাতাব নতুন-দা, লালু, বছব পঞ্চাশ পূর্বেব একটি দিনেব কাহিনী, লালু ও দেওঘবেব স্মৃতি)

প্রবন্ধ	প্রকাশকাল
১। নাবীব মূল্য	··· ১৯১৪ ইং
২। সত্যাশ্রয়ী	··· ১৯২৯ ”
৩। তরুণেব বিদ্রোহ	··· ১৯২৯ ”
৪। স্বদেশ ও সাহিত্য	··· ১৩৩২ বাং
৫। শবৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ	··· ১৯৩৭ ইং

নাটক	প্রকাশকাল
১। ষোড়শী	··· ১৯২৭ ইং
২। বমা	··· ১৯২৮ ”
৩। বিজযা	··· ১৯৩৪ ”

বারোয়ারি উপন্যাসের অংশ

১। বাবোযাবি উপন্যাস (২১ ও ২২ অধ্যায) ··· ১৯২১ ইং

২। বসচক্র, সূচনা ··· ১৩৪৩ বাং

৩। ভালমন্দ* সূচনা ··· ১৯৫৩ ইং

শবৎচন্দ্রেব পত্রাবলী ··· ১৩৫৪ বাং

শবৎ-সাহিত্য সংগ্রহ* (বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত শবৎচন্দ্রেব বচনাবলী)

শবৎচন্দ্রেব অপ্রকাশিত বচনা* (বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বচনাবলীব সংগ্রহ)

---

* মৃত্যুব পবে গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত